জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

"যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে খিলিয়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,—
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে
রহিবে সেথায় চির তার ধূপছায়া।"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
M.A., F.S.S., F.R.E.S.,
বিরচিত

কলিকাতা
১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

 [মূল্য দুই টাকা মাত্র

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড,
"আদিব্রাহ্মসমাজ" যন্ত্রে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যাঁহার গৌরবোজ্জ্বল ছাত্রজীবনের অবিচলিত উৎসাহ,

অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিসীম বিদ্যানুরাগের

কাহিনী বাল্যকালে আমাকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিত;

যাঁহার সাফল্য-মণ্ডিত পরিণত জীবনের অপূর্ব্ব

কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিরবচ্ছিন্ন সাধুতা ও প্রেমময় ব্যবহার

আমার সম্মুখে অনধিগম্য আদর্শরূপে সর্ব্বদা বিরাজিত;

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে বিগতস্পৃহ

আমার সেই দেবতুল্য পূজনীয় মধ্যম মাতুল

শ্রীযুক্ত রায় সতীশচন্দ্র দে বাহাদুর, এম-এ, এম-বি,

মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তিভরে নিবেদিত হইল।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান প্রস্তাবটী সর্ব্বপ্রথমে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকটিত হয় এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পুনর্মুদ্রিত হয়। এক্ষণে সমগ্র প্রস্তাবটী সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইল।

এই গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহ ও প্রকাশ বিষয়ে যাঁহাদিগের নিকট আমরা ঋণী তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট আমরা এই অবসরে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইঁহাদিগের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং বহু নীতিগর্ভ সদ্‌গ্রন্থের লেখক পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। ইঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২রা ভাদ্র, ১৩৩৪ } শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বিষয়-বিভাগ

সূচনা ১

বংশবিবরণ ২

জন্ম ও বাল্যজীবন ৪

শিক্ষা ৫

বিদ্যালয় ত্যাগ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা ... ৮

সঙ্গীত ও নাট্যকলার চর্চ্চা ... ৯

"নবনাটক" ১০

হিন্দুমেলা ১৯

পারিপার্শ্বিক প্রভাব ২২

সাহিত্যসাধনার প্রথম ফল—"কিঞ্চিৎ জলযোগ" ২৬

স্ত্রীস্বাধীনতার অগ্রদূত ৩৭

জমিদারী কার্য্য পরিচালনা ৩৮

"পুরুবিক্রম নাটক" ৩৮

"সরোজিনী" ৫৬

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব—ঘরে ও বাহিরে ৪৬

"ভারতী" ৬০

"এমন কর্ম্ম আর করবো না" ... ৬১

"অশ্রুমতী" ৭৩

"স্বপ্নময়ী" ১০১

সারস্বত সমাজ ১১০

বিদ্বজ্জনসমাগম	১২
"হঠাৎ নবাব"	১২
ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ষ্টীমার পরিচালনা ...	১২৫
"বালক"	১৩৪
পত্নীবিয়োগ	১৩৫
'সাধনা'	১৩৭
চিত্রাঙ্কন	১৩৮
'হিতে বিপরীত'	১৪৬
'স্বরলিপি গীতিমালা' ও 'বীণাবাদিনী' ...	১৪৭
'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ'	১৫১
'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'	১৫৫
সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ	১৫৬
য়ুরোপীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ	১৬০
মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে অনুবাদ ...	১৬২
ব্রহ্মদেশীয় নাটক	১৬৫
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৭৭
রাঁচিপ্রবাস—জীবন-স্মৃতি	১৭৮
স্মৃতি-সভা	১৮২
চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস	১৮৩
বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান	১৮৯
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত রেখা-চিত্রাবলী ...	১৯৩

চিত্রসূচী

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বার্দ্ধক্যে) মুখপত্র

২। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ... ২ পৃষ্ঠার সম্মুখে

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩ ,,

৪। সারদা দেবী ... ৪ ,,

৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫ ,,

৬। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬ ,,

৭। শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ... ৭ ,,

৮। মনোমোহন ঘোষ (যৌবনে) ৮ ,,

৯। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন ... ১১ ,,

১০। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১২ ,,

১১। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৩ ,,

১২। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৭ ,,

১৩। অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী ... ২৪ ,,

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৩৩ ,,

১৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে) ৪৬ ,,

১৬। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ... ৫৬ ,,

১৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ৫৯ ,,

১৮। শরৎকুমারী চৌধুরাণী ... ৭০ ,,

১৯। প্রৌঢ়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ... ৮১ ,,

২০। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ...১১২ পৃষ্ঠার সম্মুখে
২১। উইলিয়ম রদেনষ্টাইন ...১১৮ "
২২। রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ১৫২ "
২৩। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ১৭০ "
২৪। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি১৭৪ "
২৫। শান্তিধাম ১৭৮ "
২৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর ১৮৭ "

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাচিত্রাবলী

২৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৮। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯। সৌদামিনী দেবী
৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩১। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩২। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
৩৩। শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৪। শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
৩৫। শ্রীসত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী
৩৬। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

চিত্র-সূচী

১। কৈলাসচন্দ্র বসু — মুখপত্র
২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তরুণ বয়সে) ... ১২
৩। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ২২
৪। রামচন্দ্র মিত্র ২৯
৫। শ্রীনাথ ঘোষ ৩৩
৬। কিশোরীচাঁদ মিত্র ... ৩৫
৭। কালীপ্রসন্ন সিংহ ৩৭
৮। কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন ... ৪১
৯। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব ৪৩
১০। মেরী কার্পেণ্টার ৪৯
১১। রামগোপাল ঘোষ ৫৩
১২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৬১
১৩। রমাপ্রসাদ রায় ... ... [illegible]
১৪। রাজা রামমোহন রায় ৭২
১৫। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ... ... [illegible]
১৬। ডেভিড হেয়ার ও তাঁহার দুইজন ছাত্র ৮৫
১৭। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৯১
১৮। লর্ড ডালহৌসী ৯৩

১৯। দ্বারকানাথ মিত্র ৯৭
২০। নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ... ৯৯
২১। রমাপ্রসাদ রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর ... ১১১
২২। কৃষ্ণদাস পাল ১১৫
২৩। লর্ড ক্যানিং ১১৭
২৪। রমাপ্রসাদ রায়ের ইংরাজী হস্তাক্ষর ... ১২৫
২৫। বিদ্যাসাগর (তরুণবয়সে) ১৪১
২৬। লালবিহারী দে ১৪৬
২৭। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৮
২৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৫০
২৯। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫২
৩০। ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডফ্ ... ১৫৭
৩১। ডেভিড হেয়ার ১৬৩
৩২। স্যর সিসিল বীডন ১৮২
৩৩। আচার্য্য ই, বি, কাউএল ১৯১
৩৪। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯৪
৩৫। রমেশচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই ১৯৬
৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৯
৩৭। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১
৩৮। স্যর রিচার্ড টেম্প্‌ল্ ২০৭

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বার্দ্ধক্যে)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

যাঁহার দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী একদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল, যাঁহার হাস্যরসসমুজ্জ্বল প্রহসনগুলি একদিন 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য'রসে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, যাঁহার সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া কত অশান্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়াছে এবং চিরদিন করিবে, যাঁহার গভীর চিন্তা-প্রসূত সন্দর্ভাবলী কত নূতন নূতন ভাব ও চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছে, যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদ্ভুত অধ্যবসায়ের ফলে বঙ্গীয় পাঠকগণ সংস্কৃত, ফরাসী, মারাঠী প্রভৃতি বহু সাহিত্য-রত্নখনির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সাহিত্যের সেই

অবিশ্রান্ত সেবক, শিল্প ও ললিতকলার সেই একনিষ্ঠ সাধক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন ও সাহিত্য-সেবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছি।

বংশবিবরণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিচয় জ্ঞাত নহেন, বঙ্গদেশে এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি নাই। বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তারাজ্যে ঠাকুর-বংশীয়গণ শতাব্দীকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং বহুদিন ব্যাপিয়া করিবেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর, সমাজের উন্নতির জন্য, রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য, উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য, দেশীয় শিল্প ও ললিতকলার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত যে মহাপুরুষ তাঁহার সমগ্র শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যিনি সকল বিষয়েই যথার্থ 'প্রিন্স্' নামের যোগ্য, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিতামহ। দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ,—বংশগৌরব কেবল অক্ষুণ্ণ নহে, উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। সকল সৎকার্য্যে অগ্রণী, দানে মুক্তহস্ত, সাধুতায় অপরাজেয়, জ্ঞান ও

প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর

(বিলাতে অবস্থানকালে)

পৃঃ—২

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(যৌবনে)

র্মের সাধনায় একনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথকে দেশবাসী মহর্ষি" আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, নাট্যকলা ও সাহিত্যে অনুরাগ, গভীর আশ্রিত-বাৎসল্য ও দীনজনে দয়া, দ্বারকানাথের নাম তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের নামের সহিত বাঙ্গালীর নিকট স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহার সুন্দর আকৃতি এবং তদধিক সুন্দর হৃদয় দ্বারকানাথের ইংলণ্ডপ্রবাসকালে কত বিলাসলালিতা ডিউক-পত্নীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, যিনি পরের দুঃখ বিমোচনার্থ স্বয়ং ঋণজালে জড়িত হইয়াও মুক্তহস্তে দান করিতেন, এবং বেতন হইতে তাঁহার অপরিমিত ব্যয় সঙ্কুলান করা অসাধ্য বলিয়া যিনি সহকারী কলেক্টর অব্ কাষ্টমসের (তৎকালে) দুর্লভ পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন,—সেই নগেন্দ্রনাথও অকালে স্বর্গারোহণ না করিলে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপর তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔরসে, সাধ্বী সারদা দেবীর গর্ভে যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ

সৌদামিনী, সুকুমারী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গগর্ভা দেবী সারদার পুত্রদিগকে পূর্ব্বপুরুষ-গণের নামোল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে হয় না—তাঁহারা সকলেই স্বনামধন্য। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি সেই জন্য গর্ব্বভরে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন;—

"ভাতে যথা সত্য হেম মাতে যথা বীর,
গুণ জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির;
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।"

জন্ম ও বাল্যজীবন। সন ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গৃহস্থিত পাঠশালায় জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে অগ্রজ হেমেন্দ্র-নাথের তত্ত্বাবধানে জনৈক গৃহশিক্ষকের নিকট ইংরাজি পাঠ আরম্ভ করেন। হেমেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সরল বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের অনেক বিষয় বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ফরাসী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হীরাসিং নামক জনৈক

সারদা দেবী

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যৌবনে

পৃঃ

পাঞ্জাবীর নিকট তিনি কুস্তি শিখিয়াছিলেন এবং শারীরিক বলের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেক প্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করাইয়াছিলেন এবং সন্তরণ-বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন—কিন্তু যৌবনে তিনি অশ্বারোহণ, শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষারীতি অতি কঠোর ছিল। তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খেলিবার সময় সঙ্কোচ করিয়া পড়িবার সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হয়। বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঠ্য পুস্তক পাঠে বিতৃষ্ণা জন্মে।

শিক্ষা। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেণ্টপল্‌স্ স্কুল, মণ্টেগু অ্যাকাডেমি, হিন্দু স্কুল ও কলিকাতা কলেজে (পরে আলবার্ট কলেজ নামে খ্যাত) বিদ্যাশিক্ষা করেন। ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পাঠে যে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। হিন্দু স্কুলে পাঠকালে তিনি পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগ না দিয়া শিক্ষকদিগের ছবি আঁকিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বচেষ্টায় রেখাচিত্র অঙ্কিত

করিতে শিখেন। এই চিত্রাঙ্কন বিদ্যানুশীলনের ফলে আমরা 'সারদামঙ্গলে'র কবি বিহারীলালের এবং রবীন্দ্র নাথের কৈশোর ও যৌবনের প্রতিকৃতি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কলেজ হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন এবং পাঠ্য পুস্তকে চিরদিন অবহেলার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেও আশ্চর্য্যরূপে সাফল্যলাভ করেন। কলিকাতা কলেজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাতে মনীষী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডব্লিউ, সি, বনার্জীর) পিতৃব্য উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদান করিতেন এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র নীতি উপদেশ প্রদান করিতেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চশিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে ভারতবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকগণের মধ্যে সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিলাত হইতে প্রত্যাগমনে

পৃঃ—৬

পৃঃ— ৭

গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র (প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিতা) গুণেন্দ্রনাথ জ্যোতি-রিন্দ্রের সমবয়সী ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, উদারহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাঠে অবহেলা করিয়া গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় অনেক সময় গান-বাজনা ও গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করিতেন। কৈশোরে ইহাঁদের মাথায় নানা প্রকার কল্পনা আসিত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতেন। সেকালের আদর্শে বসন্তোৎসব করা, পাশ্চাত্য আদর্শে ফ্রিমেসন সম্প্রদায় গঠন করা, জাতীয় পরিচ্ছদের সংস্কার-সাধন প্রভৃতি কত প্রকার খেয়াল বহু অর্থব্যয়ে কার্য্যে পরিণত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার কথা উঠে, বাঙ্গালা সাহিত্যে extravaganza নাট্য নাই। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ পুরাতন সংবাদপত্র 'প্রভাকর' হইতে কতক-গুলি মজার কবিতা দিয়া এক অদ্ভুত নাট্য প্রস্তুত করেন এবং গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় সেই অদ্ভুত নাট্যের মহলা আরম্ভ করিয়া দেন। তাহাতে একটি গান ছিল—

ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বলছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—

ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে !—

হাঃ হাঃ হাঃ—এই যায়গাটায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানের সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। বৈঠক-খানায় অনেক সময়ে ঐরূপ 'হাঃ হাঃ হাঃ' সুরে এবং দুপধাপ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত।

বিদ্যালয় ত্যাগ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং বোম্বাই প্রদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাব বাল্যবন্ধু মনোমোহন ঘোষ দুইবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে এক উদ্যানবাটিকায় তিনি প্রথমে অবস্থান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি এফ্-এ পরীক্ষা প্রদানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া

৺মনোমোহন ঘোষ (যৌবনে)

পৃঃ—৮

মনোমোহনের নিকট ফরাসীভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট বোম্বায়ের গল্প শুনিয়া বোম্বাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহাকে এফ্.এ পরীক্ষা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত বোম্বায়ে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গীত ও নাট্যকলার চর্চ্চা। বোম্বাইয়ে অব-স্থানকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন এবং একজন গুজরাটি মুসলমান কলাবিদের নিকট উত্তমরূপে সেতার বাদ্য শিক্ষা করেন। কলি-কাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পিয়ানো বাজাইতেও শিখেন। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী নামক একজন নিপুণ গায়ক তখন ব্রাহ্মসমাজে গান করিতেন। ইঁহার নিকট সঙ্গীত পূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিখিয়া লইতেছিলেন। হারমো-নিয়ামবাদক বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুনাম হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বাঙ্গলা গানের সহিত হারমোনিয়াম বাজাইতে আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি এই সময়ে হিন্দী গান

অবলম্বনে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরে বলিতে গেলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম হারমোনিয়ম বাদক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও তাঁহার খুল্লতাতপুত্র গুণেন্দ্র নাথের সঙ্গীতের ন্যায় নাট্যকলায়ও গভীর অনুরাগ ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী, জ্যোতিবাবুর সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিলিয়া এই সময়ে একটি নাট্যসমিতি গঠিত করেন। এবং মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত নাটকের অভিনয়ে কৃষ্ণকুমারীর জননীর ও শেষোক্ত নাটকের অভিনয়ে সার্জ্জনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইরূপ অভিনয় করিতে করিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাবের প্রতি ইহাঁদের দৃষ্টি পতিত হয়।

'নবনাটক'। উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইবার জন্য ইহাঁরা ব্যগ্র হইলেন। 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'র তৎকালীন প্রধান শিক্ষক এবং ইহাঁদের ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় পরামর্শ দিলেন, কৌলীন্য বিবাহ

প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক প্রণয়ন করান হউক। বিষয় স্থির হইবামাত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে উক্ত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের রচয়িতাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

উক্ত বিজ্ঞাপনানুসারে কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু একখানিও পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইল না। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে কোনও খ্যাতনামা নাট্যকারের উপর নাটক লিখিবার ভার অর্পণ করা স্থির হইল। তখন নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ তর্করত্ন উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাটীতে, 'বেণীসংহার' ঐ বৎসরে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে, 'রত্নাবলী' ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাইকপাড়া রাজবাটীতে এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শাঁখারীটোলায় বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার উপরই সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। গুণেন্দ্রনাথের অগ্রজ সাহিত্য-রসিক গণেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থিয়েটার

ছেলেখেলায় হয় না। থিয়েটার যদি করিতে হয় তবে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাল করিয়া করাই উচিত।" তিনি পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৫০০৲ পাঁচশত টাকা করিয়া দিলেন এবং নাট্যশালা সমিতি নূতন করিয়া গঠিত করিলেন।

এই নাট্যশালা সমিতির অনুরোধে রামনারায়ণ তর্করত্ন অল্প সময়ের মধ্যেই 'নব নাটক' নামক নূতন নাটক প্রণয়ন করিলেন। ১২৭৩ সনের ২৩শে বৈশাখ এক প্রকাশ্য সভা আহূত হইল এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নাটকখানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। সভাপতি প্যারীচাঁদ মিত্র রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রতিশ্রুত পুরস্কার বলিয়া প্রদান করিলেন। কেবল ইহাই নহে, গণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় এবং গ্রন্থ-স্বত্বও নাট্যকারকে প্রদান করিলেন।

অতঃপর অভিনয়ের বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল। গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না। ঊনবিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক জ্যোতিরিন্দ্র কন্‌সার্টের হারমোনিয়মবাদকের ভার গ্রহণ করিলেন; অভিনয়েও নটীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নটীর মুখে একটি সুললিত সংস্কৃত সঙ্গীত ছিল:—

৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃঃ—১২

৺ গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর

পৃঃ — ১৩

মলয় নিলয় পরিহারপুরঃসর-
দূর সমাগম ধীরে,
বিকচ কমলকুল-কলিকা পরিমল-
বাহিনী বহতি সমীরে।
বহু পরিণায়ক নাথ বধূরব-
সীদতি সপদি শরীরে,
জ্বলদতিবিরহ কৃশানুকৃশা কিল
মজ্জতি লোচননীরে॥

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারি (১২৭৩ সাল ২২শে পৌষ) যোড়াসাঁকোয় নবনাটক প্রথম অভিনীত হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিই অভিনয়-স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে অভিনয়ের সুখ্যাতি করেন। দর্শকগণের আগ্রহাতিশয্যে ইহার পর উপর্যুপরি আটবার যোড়াসাঁকোয় নবনাটক অভিনীত হয়।

এই অনুষ্ঠানে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের চিরানন্দময় উপাসক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে কালীগ্রাম হইতে গণেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্যদ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—

কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পূর্ণ করিলে।"

নবনাটকের আখ্যানভাগে তাদৃশ্য বৈচিত্র্য ছিল না। স্ত্রীপুত্র সত্ত্বেও বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহের বিষময় ফল প্রদর্শন করাই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। গবেশ নামক জনৈক জমিদার, স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করেন। নবপরিণীতা স্ত্রী চন্দ্রলেখার উৎপীড়নে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সুবোধ দেশত্যাগ করেন। ক্রমে বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। অবশেষে চন্দ্রলেখার প্রদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের ফলে গবেশ বাবুও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই নাটকের অভিনয় ও সজ্জাদি এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে গ্রন্থের যাহা কিছু দোষ ছিল তাহা কাহারও লক্ষ্যপথে আসে নাই। বলা বাহুল্য স্ত্রীগণের ভূমিকা পুরুষদিগের দ্বারাই অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র

নাথের ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীলকমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথের শ্যালক অমৃতলাল ও বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। চিত্রপটগুলিও নিপুণ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। পঞ্চম দৃশ্যের চিত্রপটে নানাবিধ লতা পাতা এবং জীবন্ত জোনাকী পোকা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত হইয়াছিল এবং এক-একটী পোকার জন্য দুই আনা হিসাবে পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইয়াছিল।

অভিনয় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে রাম-নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় মনের আনন্দে নাটকের প্রতিকূল সমালোচনাকারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—"যারা প্লট্ (plot) নাই প্লট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক।"

প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের একস্থানে এই নাটক ও তাহার অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"The plot is poor and destitute of interesting incidents, * * * In truth,

the acting was infinitely better than the writing of the play."

কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও এই অভিনয়ের সুখ্যাতিপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আমরা উহা হইতে নটীর ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ কিরূপে দর্শকগণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিতেছি :—

"The play opened with the usual appearance of Nat and Nattee with the customary prologue. Both were clad beautifully and Nattee particularly presented a very graceful figure. Her attitude, gestures, and motions were as delicate as they were becoming, though her singing, we must confess, was not up to the mark !"

সঙ্গীত সম্বন্ধে সমালোচক যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার বিষয়ে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তৎকালে ব্রাহ্মসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুগায়করূপে বিলক্ষণ খ্যাতি হইয়াছিল, বোধ হয় সংস্কৃত গীত বলিয়া সাধারণের তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর

পৃঃ—১০

অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে আহম্মদাবাদ হইতে লিখিয়াছিলেন,—"I am afraid Jotee will feel rather lonely here. You know how shy he is by nature. So I can't get him to mix much with the Europeans or natives here. I suppose time alone will cure him." বৃদ্ধ বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"হাঁ, হেমদাদার সামনে অভিনয় করতে হবে মনে করে আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল।" তাঁহার শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এই স্থানে শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের একটি স্মৃতি-কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অমৃতলাল বলেন, যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলেজে প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়েন, তখন অমৃতলাল হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ত্রয়োদশবর্ষ-বয়স্ক ছাত্র। এক একদিন গাড়ী আসিতে বিলম্ব হইলে ছুটির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (তৎকালে গোলদীঘিতে অবস্থিত) ডেভিড হেয়ারের প্রস্তর মূর্ত্তির নীচে দণ্ডায়মান

হইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেন। অমৃতলাল মুগ্ধ হইয়া অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার তেজঃপূর্ণ পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেন, সে অপরূপ সৌন্দর্য্য কোনও গ্রীক্ ভাস্করের আদর্শ হইতে পারিত। রহস্য করিয়া অমৃতলাল বলেন যে, 'তখন ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক ছিলাম তাহাই রক্ষা, নতুবা ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা হইলে কি করিতাম বলা যায় না।'

নটীবেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরমা সুন্দরী যুবতীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক লিপিবদ্ধ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে' এই সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে। সেই বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নটীর বেশ পরিয়াই, সাজ-ঘরে কন্‌সার্টের সহিত হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সীটন কার সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কনসার্ট শুনিবার জন্য, এবং কি কি যন্ত্রে কনসার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য, কনসার্টের ঘরে

ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই "Beg your pardon, জেনানা, জেনানা" বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে জেনানা কেহই ছিলেন না, যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি স্ত্রী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।"

হিন্দুমেলা। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর একটি আন্দোলনে মাতিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহপাঠী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রচারিত 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামক ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, নবগোপাল মিত্র মহাশয়, স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কল্পনানুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈত্র মেলার (পরে হিন্দু মেলা নামে খ্যাত) অনুষ্ঠান করেন। এই মেলায় স্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় সঙ্গীত এবং বক্তৃতাদি দ্বারা দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইত। গণেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এবং উৎসাহেই এই প্রদর্শনী সাফল্য লাভ করিয়াছিল। গণেন্দ্রনাথ এই মেলায় গীত হইবার জন্য অনেকগুলি সুন্দর জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভারত-

সঙ্গীত—"মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান"—যে গান লক্ষ্য করিয়া 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"এই মহা সঙ্গীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"—সেই গান এই মেলার জন্যই প্রথম রচিত হয়।

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, 'উদাসিনী'র কবি অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি এই মেলার জন্য জাতীয় ভাবের উদ্দীপক বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন আহম্মদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট। গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজি পত্রাংশের অনুবাদ পাঠে প্রতীত হয় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন ফরাসীভাষা, চিত্রাঙ্কনবিদ্যা ও সেতার বাদন শিক্ষা করিতেছিলেন :—

১১-৫-৬৭—জ্যোতি আমার নিকট ফরাসীভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং

মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু জ্যোতি পারিবে কিনা জানি না।

২-৬-৬৭—জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে।

৪-৯-৬৭—জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসী শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় লাজুক—সমাজে মিশিতে পারে না। বোধ হয় বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

দ্বিতীয়বার হিন্দু মেলার অধিবেশনের পূর্ব্বেই জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বাৎসরিক মেলায় পঠিত হইবার জন্য 'উদ্বোধন' নামক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ বলিয়া হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে মেলায় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ১৯।২০ বৎসর বয়সে রচিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটির কিয়দংশ পাঠকগণের কৌতূহল পরি-তৃপ্ত্যর্থে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান?

ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন ?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থি চর্ম্ম সার !
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয় !
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন্ প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ?
যে জননী পয়ঃসুধা শত নদী-ধারে,
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে ;
যে জননী মৃদু হাসি' সব দুঃখ ভুলি'
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি' ;
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।"

পারিপার্শ্বিক প্রভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী বহুদিন হইতেই বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সৎসাহিত্য প্রচারের

একটি প্রধান যন্ত্রস্বরূপ ছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ প্রভৃতি সাহিত্য মহারথীদিগের মৌলিক গবেষণা-প্রসূত রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার প্রচারে সহায়তা করিয়া, জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, যেরূপ অপূর্ব্ব গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের পূর্ব্বে আর কোনও সাময়িক পত্রের ভাগ্যে সেরূপ গৌরবলাভ ঘটে নাই। মহর্ষি স্বয়ং বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও অকপট সেবক ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং কি তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায়, কি কাব্যচর্চ্চায়, কি নাটকপ্রণয়নে, কি সদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনায় —সকল দিকেই তাঁহাদের প্রতিভা আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ সাহিত্যিক আবেষ্টনের মধ্যে লালিত হইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথও যে অল্প বয়সেই মাতৃভাষানুরাগী এবং সাহিত্যসেবায় উন্মুখ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

এই স্থানে তাঁহার বাল্যবন্ধু এবং সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান সহযোগী ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যকালে

মহর্ষিদেবের বাটীর পূজার দালানে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন,—"এই পাঠশালায় বাহিরের চারি-পাঁচজন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করাইতেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের অ্যাটর্ণি, 'ভারতী'র সাহিত্য-সমালোচক, সুলেখক, সুকবি) পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখানা বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন।"

রবীন্দ্রনাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিযাছেন,—

"৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম্-এ। সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। বায়রণ এবং শেকস্‌পীয়রের রসে তিনি আগাগোড়া রসিয়া উঠিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার

৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

পৃঃ—২৪

অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে-বেসুরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে-সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ-অবৈধ যাহা-কিছু হাতের কাছে পাইতেন তাহাতে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইহাঁর অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইহাঁর কোন বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইহাঁর ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। 'উদাসিনী' নামে ইহাঁর একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইহাঁর অনেক গান লোককে গাহিতে

শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

"সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ। অক্ষয় বাবুর সেই অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধ-শক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"

অক্ষয়চন্দ্রের উৎসাহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

সাহিত্যসাধনার প্রথম ফল—"কিঞ্চিৎ জলযোগ।"—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ—"কিঞ্চিৎ জলযোগ!" নামক প্রহসন প্রকাশিত হয়। উহাতে কিন্তু নবীন গ্রন্থকার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। তখন কেশবচন্দ্র সেন 'অগ্রসর' ব্রাহ্মদিগকে লইয়া নূতন সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন,—'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং পূর্ণমাত্রায় স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রহসনে নব্যপন্থীদলের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত আছে।

গ্রন্থের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই :—

ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র নব্যদলের ব্রাহ্ম, তাঁহার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। বিধুমুখী একাকী 'মিরজাপুরে স্যানের গির্জেয়' যান, প্রচারক প্রেমনাথ বাবুর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করেন, পূর্ণচন্দ্র প্রত্যক্ষে বিধুমুখীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিলেও মনে তাঁহার বিলক্ষণ ঈর্ষা জন্মে। পূর্ণচন্দ্র স্বয়ং নিষ্কলঙ্কচরিত্র সাধু নহেন। তিনি মদ্য পান করেন। বিবাহের পূর্ব্বে কামিনী নাম্নী এক রমণীর প্রতি তিনি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন এবং বিবাহের পরেও রোগী-চিকিৎসার ব্যপদেশে তিনি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে যান।

একদিন পেরুরাম নামক জনৈক বেকার লোক পাওনাদারের ভয়ে পলাইয়া অবশেষে মিরজাপুরে 'স্যানের গির্জে'র সম্মুখে একখানি পাল্কী দেখিয়া তাহার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে। পাল্কীখানি বিধুমুখীর। বেহারারা কর্ত্রীঠাকুরাণী পাল্কীতে উঠিয়াছেন ভাবিয়া পেরুরামকে পূর্ণচন্দ্রের বাটীতে লইয়া আসে। পেরুরাম গৃহে প্রবেশ করিয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে, একদিক দিয়া পূর্ণচন্দ্র ও অপর দিক দিয়া ও বিধুমুখী বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পেরুরাম আর একটি ঘরে আশ্রয় লইল। বিধুমুখী স্বামীর নিকট উড়ে বেহারাদের নামে

অভিযোগ করিয়া বলিলেন, "তোমার উড়ে বেহারাদের তুমি তো ছাড়াবে না। আজকের মন্দিরের সার্ভিস হয়ে টয়ে গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠ্‌তে যাই, না দেখি পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার রাত্রি, কি করি, এমন সময়ে আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবু আমাকে এই রকম অবস্থায় দেখ্‌তে পেয়ে বল্লেন যে, এস, আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেব। আ! আমি তখন বাঁচলেম, তখন আমার মনে হল যেন প্রভু যীশুখৃষ্ট স্বয়ং এসে আমাকে এই বিপদ-সাগর হতে উদ্ধার কল্লেন; তারপর 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট' বলে আমার নিকট হতে বিদায় লইলেন, আমিও ভক্তিভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম করে বাটীর মধ্যে ঢুক্‌লেম।"

"অন্ধকার রাত্রি", "হস্ত ধারণ করে" ইত্যাদি শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের ঈর্ষা উদ্রিক্ত হইল, কিন্তু সেই রাত্রে কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল বলিয়া পূর্ণচন্দ্র অন্য কথা ছাড়িয়া রোগী চিকিৎসার জন্য বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। বিধুমুখী তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন 'আমাকে বিয়ে না করে যদি তাকে বিয়ে কত্তে তাহলে তোমার পক্ষেও ভাল হত।'

পূর্ণচন্দ্র যে তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন তাহা অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন "সন্দেহটা কি ভয়ানক জিনিস্। * * আমার মনে কোন কু-সন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না। সে দিন নাচ দেখতে গিয়েছি—আমি যে কাছে আছি, তা দেখতে পায় নি—একজন লোক আর একজন লোকের কাছে বল্‌চে যে, প্রেমবাবু সমস্ত দুপুর ব্যালাটা বিধুমুখীর ওখানে কাটিয়ে এসেছে * * * লোকে যে রকম প্রেমনাথ বাবুর বর্ণনা করে—দেখতে সুশ্রী—বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা—তাতে অন্য লোকের ঐ কথা শুন্‌লে হঠাৎ ভয় হতে পারে বটে,—কিন্তু ঐ কথা যখন আমার কাণে এল, তখন তো আমার কিছুই মনে হল না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বিধুমুখী কক্ষান্তরে হঠাৎ পেরুরামকে দেখিয়া প্রথমে চোর মনে করিয়া ভীত ও চমৎকৃত হইলেন কিন্তু পরে কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন যে, সে একটা নির্ব্বোধ লোক, ভুল করিয়া তাহাকে তাঁহার পাল্কি-বেহারারা লইয়া আসিয়াছে। বিধুমুখীর মাথায় একটা ফন্দী আসিল। তাঁহার স্বামী যে কথায় কথায় বলেন তাঁহার কোন কু-সন্দেহ হয় না—তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। তিনি বেকার পেরুরামকে বাটীর সর-

কারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন পেরুরাম নামটা বিশ্রী, উহার পরিবর্ত্তে তোমার নাম প্রেমনাথ রাখিলাম। প্রেমনাথকে নিকটে বসাইয়া পুরাতন ভৃত্য ভোলাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন প্রেমনাথ বাবুর জন্য জলখাবার লইয়া আয়। ইহার পর স্বয়ং জলখাবারের তত্ত্বাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে পূর্ণচন্দ্র (যিনি গোপনে প্রেমনাথ বাবুর সহিত স্ত্রীকে আলাপ করিতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিতে-ছিলেন) আসিয়া পেরুরামের সহিত মহা কলহ বাধাইয়া দিলেন। ভৃত্য কর্ত্তৃক আনীত জলখাবার ফেরত দিয়া পেরুরামকে তরবারি লইয়া আক্রমণ করিলেন। বিধুমুখী আসিয়া বলিলেন "আমার উপর তোমার একটা জঘন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে? * * কালই আমি বাপের বাড়ি যাব—আর সেখানে যদি বাপ-মায়ে না স্থায়, তা হলে আমাদের ভারতাশ্রম হোটেলে গিয়ে বাস করব।" পেরুরাম মনে করিয়াছিল পূর্ণচন্দ্র :বিধুমুখীর পুরাতন সরকার এবং তাহাকে ছাড়াইয়া পেরুকে নিয়োগ করা হইযাছে বলিয়াই তাহার প্রতি পূর্ণচন্দ্রের এই আক্রোশ। হঠাৎ পূর্ণবাবুর নাম শুনিয়া সে চমৎকৃত হইল, কারণ সে পূর্ণবাবুর এক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে সুপারিস-

পত্র লইয়া তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল। বিধুমুখী স্বামীর ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিবার জন্য তাহাকে প্রেমবাবু :বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, ইহা পরে প্রকাশ পাইল। বিধুমুখী যথার্থই পতিপরায়ণা। পূর্ণচন্দ্র গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার কখনও সন্দেহ হয় না, সেই গর্ব্ব কৌশলে চূর্ণ করিলেন। পূর্ণচন্দ্রও ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য গোপনে পেরুরামকে বাগানে লইয়া গিয়া, সে যেন তরবারি লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে এইরূপ অভিনয় করিতে বলিলেন। পতি-প্রাণা বিধুমুখী তাঁহার স্বামীকে নিহত করিতেছে মনে করিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। পরে পূর্ণচন্দ্র ও পেরু উভয়ে আসিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলে বিধুমুখী সন্তুষ্ট চিত্তে পুরাতন ভৃত্য ভোলাকে পেরুর জন্য জলখাবার আনিতে বলিলেন। কিন্তু জলখাবার আসিবার পূর্ব্বে আর একটি ঘটনা ঘটিল। পেরুরাম কামিনীর প্রণয়াভিলাষী, কামি-নীর বাটীতে সে একটি পত্র পায়, তাহাতে লিখিত ছিল—"প্রেয়সী কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে—প।" এই পত্রখানি ঘটনাচক্রে বিধুমুখীর হাতে পড়িয়া গেল, স্বাক্ষর চিনিতে বিধুমুখীর কষ্ট হইল না, "প—সংক্ষেপ বটে; কিন্তু অর্থ-পূর্ণ।" তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ভৃত্য

জলখাবার আনিলে তাহা ফেরত দিলেন এবং 'ভারতাশ্রমে' চলিয়া যাইবেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাল্কি আনিতে আদেশ দিলেন। ইতোমধ্যে পেরু সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। সে বুদ্ধি খাটাইয়া তখন বলিল, "আপনি পূর্ণবাবুর সমক্ষে মিথ্যা অভিনয় করিয়া তাঁহাকে যেরূপ পরীক্ষা করিতেছিলেন, পূর্ণবাবুও সেইরূপ স্বামীর প্রতি আপনার বিশ্বাস পরীক্ষার করিবার জন্য আমার হস্তে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই পত্রখানি দিয়া কৌশলে আপনাকে দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই কথায় বিধুমুখীর সন্দেহ দূরীভূত হইল, পূর্ণবাবু পেরুরামের বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তৃতীয় বার পুরাতন ভৃত্যের প্রতি জলখাবার আনিবার আদেশ হইল। সকলেই আনন্দ সহকারে জলযোগে যোগদান করিলেন।

এই প্রহসনের মধ্যে স্থানে স্থানে তাৎকালিক নব্যপন্থী ব্রাহ্মদিগের কোনও কোন আচরণের প্রতি রহস্য-পূর্ণ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। মদ্যপানে এবং তৎপরে বিধুমুখীর 'পরমগুরু, পরম পূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তি-ভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন' সেন মহাশয়কে স্যান্‌জা বলিয়া সম্বোধন করায় পূর্ণচন্দ্র 'পাপের উপর পাপ' করিয়াছিলেন। পাপক্ষালণের জন্য বিধুমুখী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বলিলেন "আমার কাছে ঘাট মানলে কি হবে? * * একবার অনুতাপ কর, তা হ'লে পাপ ক্ষয় হইবে।"

নানা বিষয়ে হাস্যকর পরিণতি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার প্রহসনের স্থানে স্থানে অনাবশ্যক স্থলে প্রার্থনা ও অনুতাপের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, নব্য ব্রাহ্মগণের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে এই প্রহসন লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া- । গ্রন্থখানিকে 'মিরর' অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থখানির প্রশংসাপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, " 'একেই কি বলে সভ্যতা'র জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে, হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষ-রূপে বর্জ্জিত, 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'সধবার একাদশী'। সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইলেও অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নয় বটে কিন্তু

ইহাকেও বর্জ্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটী গুণ এই যে, তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র। এ প্রহসন, প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য্য না থাকুক, নিতান্ত অভাবও নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণী-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেন না ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য, তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। কে ব্যঙ্গের যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে; সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব।

"কার্য্যের যে সকল গুণ আছে তন্মধ্যে একটী ফলোপ-ধায়কতা। কার্য্য সফল, নয় নিষ্ফল। কার্য্য সফল হইলে তাহার ফলে যদি অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলে। যদি তাহার ফলে, পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্ত্তার অভিপ্রায়ভেদে পাপ বা ভ্রান্তি বলে। যদি অসদভিপ্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্য্য কৃত হইয়া থাকে তবে তাহা পাপ বা দুষ্ক্রিয়া। যদি অসদভিপ্রায়

ব্যতীত ঘটিয়া থাকে তবে তাহা ভ্রান্তিমাত্র। দেখা যাইতেছে যে পুণ্য, পাপ বা ভ্রান্তি, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ, ভর্ৎসনা, দণ্ড বা শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য।

"নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থাবিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না, যে স্থানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্য অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। বাঙ্গালায় কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বলিতে হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত ভ্রান্তির সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটীর জন্য পৃথক পৃথক নাম আছে; একটীকে error বলে আর একটীকে mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, mistake ব্যঙ্গের যোগ্য। ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ, ক্রিয়ায় অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ পুণ্যের উপযোগী চিত্তভাবকে ধর্ম্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অধর্ম্ম বলে, এবং ভ্রান্তির উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলে। এই

তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুটী ইংরাজী কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটী ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, folly ও তদ্রূপ। এই নাটকে বিধুমুখীর বা পূর্ণচন্দ্র বা পেরু-রামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা ঐরূপ অসঙ্গত কার্য্য বা ভাবের উপর লক্ষিত। সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর। পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন কোন স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে ভদ্রলোকে পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, একটু দোষ বটে; কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদর্য্য ভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।"

কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' বলিয়া-ছিলেন, "Its tendency is far from immoral." নব প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রহসনখানি

গুণগ্রাহী দর্শকগণের সমক্ষে মহা-সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন না। যদিও তিনি উহার কুফলের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ব্যক্তিগত ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে তিনি শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা কাদম্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহ-সজ্জার প্রতি কাদম্বরী দেবীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি সকল দ্রব্য অতি সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন। উদ্যানরচনায় তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং শিকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামের পক্ষপাতী ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকেও বীরাঙ্গনা করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহণে অভ্যস্তা করাইয়াছিলেন। সেকালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যখন দুইটী আরব ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন, তখন লোকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন

তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না বা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেন না।

জমিদারী কার্য্য পরিচালনা। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর তাঁহাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহাকে জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, একবার মহর্ষি জমিদারী পরিদর্শনার্থ একস্থানে গমন করিলে প্রজারা তাঁহার নৌকার অগ্রভাগ সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেয়। ইহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিরূপ প্রজারঞ্জক ছিলেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরুবিক্রম-নাটক। নবগোপাল মিত্র প্রবর্ত্তিত 'হিন্দুমেলা'র অনুষ্ঠানের পর হইতে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের মনে জনসাধারণের মধ্যে দেশ-হিতৈষণা উদ্বোধিত করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে বীর-রসাত্মক নাটক দ্বারা ভারতের অতীত-গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তন করিলে দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্ম-

বোধ জাগরিত হইতে পারে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ গুণেন্দ্রনাথের সহিত কটকে জমিদারী পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁহার প্রথম স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক 'পুরুবিক্রম' রচনা করেন; গুণেন্দ্রনাথের উৎসাহে গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, কিন্তু এবারেও গ্রন্থকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেন।

'পুরুবিক্রম' বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থখানির পরিচয় দিব।

"নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্দর সা (Alexander), পুরু (Porus), তক্ষশীল (Taxilus), এফোষ্টিয়ান (Hephostion) ইহারাই প্রধান; মহিলাগণের মধ্যে প্রধান ঐলবিলা—কল্লুপর্ব্বতের রাণী, এবং অম্বালিকা—তক্ষশীলের ভগিনী।

"মহাবীর সেকেন্দর সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারত-বিজয়ে অগ্রসর হইতেছেন, বিতস্তা নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। রাণী ঐলবিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থে কৃতসংকল্পা। তিনি অবিবাহিতা, রূপ-গুণবতী। প্রচার

করিয়াছেন যে, 'যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বদেশের জন্য যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন।' মনে মনে পুরুরাজের শৌর্য্যে বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পুরুরাজ বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। পুরুরাজ এদিকে যথার্থই বীরপুরুষ ও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ এবং স্বীয় ভগিনী অম্বালিকাকে সেকেন্দরকে প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক। এদিকে অম্বালিকাও সেই অসদিচ্ছার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অম্বালিকাকে সেকেন্দর পূর্ব্বে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; অম্বালিকা এক্ষণে সেকেন্দরের প্রতি অনুরক্তা। ভ্রাতা-ভগিনী উভয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করিল যে, উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিবে। কিন্তু ঐলবিলা তক্ষশীলকে ঘৃণা করেন এবং পুরুরাজে একান্ত অনুরাগিণী, সুতরাং ঐলবিলা ও পুরুরাজ মধ্যে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ভ্রাতা ও ভগিনী ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্তা পার হইয়া আসিলেন। পুরুরাজ ও সেকেন্দরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। একজন যবন

সৈনিক অন্যায় আক্রমণ করিয়া পুরুরাজকে আহত করিল। পুরুরাজ বন্দী ও শায়িত। ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা কতক সিদ্ধ হইল। পুরু ঐলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষশীলকে বধ করিলেন। পরে সেকেন্দর পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মোচন করিলেন, অম্বালিকাকে গ্রহণ করিলেন না; অম্বালিকা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও ঐলবিলার সন্দেহ-ভঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের মিলন করিয়া দিলেন।

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। * * লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররস-প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। * * * যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।"

আচার্য্য লালবিহারী দে সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগেজিন" দীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে বলিয়াছিলেন "The

story is well told; the descriptions are lively; some of the characters are well drawn, and the language is simple and idiomatic."

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রেও গ্রন্থের সুখ্যাতিপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুরুবিক্রমের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বীররসাত্মক উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—উহা বীর-রসের খতিয়ান। তাহাই বটে! আমাদের মনে পড়ে কৈশোরে আমরা কতবার অপূর্ব্ব আগ্রহের সহিত এই নাটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম এবং সৈন্যগণের প্রতি পুরুরাজের সেই ওজস্বিনী বাণী তৎকালে আমাদের তরুণ হৃদয়ে কিরূপ উদ্দীপনার বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়া দিত:—

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥

বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার,
জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে॥

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত-ভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন?
"বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে একথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম॥

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

পিতৃ-পিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে,
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম।
রয়েছেন নেত্রপাতি, দে'খ যেন যশোভাতি,
না হয় মলিন,—থাকে ক্ষত্রকুল নাম॥

স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক সেই কাপুরুষে, শতধিক্ তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥

যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।

এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ়পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমরা একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনগুলি অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অভিনয়-যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই—বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের তখন এমনই দুর্দ্দশা। এই সময়ে পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশ হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। যদিও তখন স্বত্ব-সংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার খাতিরে আমরা কয়েকজন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের অনুমতি ভিক্ষা করিতে গেলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি প্রদান করিলেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটারে পুরুবিক্রমের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, এবং রঙ্গালয়ের দর্শকগণ সুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন।" ইহার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও পুরুবিক্রম অভিনীত হয়। সিমুলিয়ার ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের) দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ পুরু সাজিতেন এবং একটি সুন্দর শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট আরব জাতীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন।

পুরুবিক্রম নাটক পরে গুজরাটী ভাষাতেও অনূদিত

হয়। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সিলভ্যান লেভি মহোদয় গুজরাটী সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে পুরু-বিক্রমের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সমালোচন-কালে অবগত ছিলেন না যে গ্রন্থখানি মৌলিক নহে—উহা বঙ্গসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদ মাত্র।

'সরোজিনী'।—কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ 'সরোজিনী' নাটক প্রকাশিত করেন। 'সরোজিনী'ও 'পুরুবিক্রমের' ন্যায় বীররসাত্মক ও স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক। উৎসর্গপত্রে গ্রন্থখানি "উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে" সাদরে অর্পিত হয়। নাটকের আখ্যান-ভাগ সংক্ষেপে এই :—

যে সময়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করেন সেই সময়ে মহম্মদ আলি নামক এক মুসলমান ভৈরবাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের ছদ্ম-বেশে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে এবং মেওয়ারের রাণাকে দেবীর প্রত্যাদেশ শুনান :—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,

৺জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
(প্রথম যৌবনে)

সরোজ-কুসুম সম ; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোরপুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।

অর্থাৎ দেবীর প্রীত্যর্থে রাণার বারোটি পুত্রকে রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে ও প্রাণাধিক প্রিয়া কুমারী কন্যা সরোজিনীকে দেবীর সমক্ষে বলি দিতে হইবে। রণক্ষেত্রে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের চির আকাঙ্ক্ষিত, সুতরাং রাণা পুত্রগণের জন্য চিন্তিত হইলেন না; কন্যাটিকে কিরূপে বলি দিবেন? কিন্তু রাণা লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ রণবীর সিংহ এবং অন্যান্য অনেকেই দেবীর প্রত্যাদেশের কথা অবগত হইয়া নিরপরাধিনী সরোজিনীকে বলি দিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য রাণাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একদিকে বাৎসল্য ও মমতা, আর একদিকে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য, রাণার হৃদয়ে বিবিধ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে লাগিল।

হৃদয়ের এই ঘাত-প্রতিঘাত গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। অবশেষে স্বদেশের জন্য রাণা কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন কন্যাকে বলি দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে তখন সরোজিনীর ভাবী স্বামী বাদলাধিপতি বিজয় সিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এই মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় সিংহের এবং মেওয়ার-সেনাপতির মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া উভয় পক্ষকে দুর্ব্বল এবং গৃহবিবাদে উন্মত্ত করিয়া চিতোর আক্রমণ করাই মুসলমানগণের উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ষড়যন্ত্র শেষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। আলাউদ্দীন চিতোরে প্রবেশ করিয়াছেন। রাজপুত-বীরগণ রণক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন, এবং সাধ্বী রাজপুতরমণীগণ অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন। এই নাটকের শেষ ভাগে "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" শীর্ষক যে ওজস্বিনী কবিতা আছে তাহা বোধ হয় অনেক পাঠকেরই মুখস্থ আছে। যখন প্রবল পরাক্রান্ত আততায়ীর দ্বারা আচরিত কোনও অন্যায়ের প্রতিকার অসম্ভব মনে হয়, তখন এই কবিতার কিয়দংশ আমাদের স্মৃতিপথে ভাসিয়া আসে এবং আমরা

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া অনন্যোপায় হইয়া শত্রুকে ভগবানের ন্যায়দণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া বলি,—

"যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"

এই কবিতাটী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে ঐস্থানে একটি বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু পুস্তকমুদ্রণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঐ স্থলে একটি কবিতা দিলেই ভাল হয়, এবং রবীন্দ্রনাথই প্রাগুল্লিখিত কবিতাটি অত্যল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া দেন।

'পুরুবিক্রমে'র ন্যায় 'সরোজিনী'রও অনেকস্থলে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপনী উক্তি আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিজয়সিংহের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্যদ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তারপর যা হ'বার তা হ'বে। ভবিষ্যতের

প্রতি দৃষ্টি কর্ত্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য ক'র্ত্তে বলচেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করে, পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্‌বে,— চলুন আমরা সেইখানেই যাই।"

গ্রন্থের শেষভাগে প্রদত্ত দেশভক্ত রামদাসের মর্ম্ম স্পর্শিনী আক্ষেপোক্তিটিও উদ্ধারযোগ্য :—

"গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব্ব চরাচর ;
চিতাধূম ঘন, ছায় রে গগন,
বিষাদে বিষাদময় চিতোর নগর!

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধতমসায় ;
জয়লক্ষ্মী বাম, ম্লান আর্য্যনাম,
পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দীশালা হায়!

স্বাধীনতা-রত্ন হারা, অসহায়া, অভাগা জননি !
ধন-মান-যত, পর-হস্ত-গত,
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি ।

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষ-বদ্ধ নিস্তেজ কৃপাণ ;
শর তূণাশ্রিত, রণ-বাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়নিশান ।

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ ভালে, উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ ?

আর কি চিতোর, তোর অভ্রভেদী উন্নত প্রাকার,
শির উচ্চ করি, জয়ধ্বজা ধরি,
স্পর্ধিবে বীর-দর্পে জগৎ সংসার ?

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ;
হয়ে পদানত, দাসব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণই জীবন ।

জ্বলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন-প্রাণ ;
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার,
চিতানলে চিন্তানল করি অবসান !

দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত গগন ;
একি রে আবার, একি দশা তার,
স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন !

রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
যবনিকা পড়ে যাক্ জীবনে আমার ॥"

'সরোজিনী'ও মহাসমারোহে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে উপর্য্যুপরি অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল। অমৃতলাল বিজয় সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়চাতুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি "রূপ ও রঙ্গে" প্রকাশিত "আমার অভিনেত্রী জীবন" শীর্ষক অতীব কৌতূহলোদ্দীপক একটী প্রবন্ধে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী বিনোদিনী সাধারণ নাট্যশালায় 'সরোজিনী'র অভিনয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

"সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমৃত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন সেই দর্শকবৃন্দও

আত্মহারা হয়ে যেতেন। একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে রাজা স্বদেশের কল্যাণকামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, উত্তেজিত রণজিৎসিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণবেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বললেন, 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর,' অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! জন-দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হল; তাঁদের ষ্টেজের উপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হল।"

আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন :—

"সরোজিনী নাটকের একটী দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন-চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু-তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের উপর ৪।৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হত। লাল রঙের সাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী সেই

জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখ রে যবন দেখ রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ ঝুপ করে

সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে; তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবুও কারু ভ্রূক্ষেপও নেই, তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

গ্রন্থকার নাম গোপন রাখিলেও তাঁহার নাম অপ্রকাশিত রহিল না। বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে সুরুচিপূর্ণ, দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলীর সৃষ্টি করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এক নূতন আদর্শের অবতারণা করিলেন। তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এমন কি পল্লীগ্রামে যাত্রার দলেও 'সরোজিনী' অভিনীত হইতে লাগিল। 'সরোজিনী'র গান সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল। কলিকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ৺অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় 'সরোজিনী'র শেষ দৃশ্যের একখানি চিত্র পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা আর্টস্কুল হইতে প্রকাশিত হিন্দুর পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্রের সহিত বিক্রীত এবং গৃহে গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' উপর্য্যুপরি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব—ঘরে ও বাহিরে। 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' প্রকাশের পর বাঙ্গালার পাঠকসমাজে নাট্যকাররূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। গৃহের বাহিরে তৎকালে তাঁহার যে অসামান্য প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, গৃহের ভিতরে যে তাহা সহস্রগুণে প্রবল ছিল তাহা বলা বাহুল্য। সাহিত্য ও শিল্পের আলোচনায়, প্রাণোন্মাদিনী সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সুর-তরঙ্গে তখন তাঁহাদিগের গৃহ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত ও প্লাবিত থাকিত এবং সেই অপরিসীম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাহার অধিকারী কত নবীন হৃদয়ে তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়া সেই স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়গুলিকে বিকশিত করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবসর কালে পরিবারস্থ মহিলাগণকেও একত্র করিয়া ইংরাজি গ্রন্থ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন এবং ইহার ফলে ইঁহাদের মধ্যেও সাহিত্যসেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয় ও তাঁহার অন্যতমা ভগিনী, সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন—"সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিন জন—অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য-চর্চ্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গী পাইলাম।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সহায়তা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে তাহা এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে :—

"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চ্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতি দাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম—তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। *

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনূ্যন বারো বৎসরের বড় ছিলেন।

"তিনি আমাকে খুব একটা বড় রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সে জন্য হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে যেমন বর্ষার প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবল পক্ষেরা সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে—কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি—স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাত নিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা পীড়নের দ্বারা কাণ-মলা এবং কাণে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ও রবীন্দ্র নাথ

পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভাল-মন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না, ভাল করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই—ধর্ম্মনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিশের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মত বালাই জগতে আর কিছুই নাই।

"এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয় বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার

একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিল।"

'ভারতী'। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে হইবে। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথই উহার নামকরণ করিলেন "ভারতী"। দ্বিজেন্দ্রনাথ "ভারতী"র সম্পাদক বলিয়া বিঘোষিত হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই মাসিক পত্রের সঙ্কল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের ভিতরে ছিলেন। এই মাসিক পত্রখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া কিরূপে বাঙ্গালার পাঠকসমাজের জ্ঞান ও আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কত সুচিন্তিত সন্দর্ভ, কত রসরচনা, কত বিদেশীয় গল্প প্রভৃতির অনুবাদ এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার অনেকগুলি রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেকগুলি সংগৃহীত হয়

নাই। প্রথম বর্ষের 'ভারতীতে' প্রকাশিত ডাক্তার বাল্মীকির 'রামিয়াড' অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। এরূপ রসরচনা বাঙ্গালা ভাষায় তৎকালে অল্পই প্রকাশিত হইয়াছিল।

"এমন কর্ম্ম আর করবো না।" 'ভারতী' যে বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বৎসরেই, অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা আষাঢ়, ১৭৯৯ শক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে আর একটি অপূর্ব্ব রত্ন দান করিলেন। পরে "অলীক বাবু" নামে পুনর্মুদ্রিত "এমন কর্ম্ম আর করব না" নামক প্রহসন বাঙ্গালা সাহিত্যে যথার্থই অদ্বিতীয়। পূর্ব্বগামীদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রহসন লিখিয়া বঙ্গবাসীকে হাসাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থের কোনও কোনও স্থান অশ্লীলতাদোষ-দুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থে কেবল "নির্ম্মল শুভ্র সংযত (?) হাস্যরস।"

প্রহসনের আখ্যান-ভাগ সংক্ষেপে এই:—অলীক প্রকাশ বাবু, সেক্সপীয়র-কৃত 'ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী' নামক নভেল, বায়রণ-কৃত 'চেম্বর্স অ্যাটলাস', কালিদাস-কৃত 'মুগ্ধবোধাদি' পাঠসমাপনে অশেষ বিদ্যোপার্জ্জনান্তর বিক্রমাদিত্য-বংশাবতংস কামাখ্যাধিপতির কন্যাকে প্রত্যা-

খ্যান করিয়া কৃষ্ণনগরনিবাসী সত্যসিন্ধু বাবুর বঙ্কিমি নভেলে দীক্ষিতা অনির্দ্দিষ্ট ভাবী পতির বিরহ-ব্যাকুলা কন্যা হেমাঙ্গিনীর পাণি-প্রার্থী হইয়াছেন। হেমাঙ্গিনী কল্পনার ধনকে অলীকপ্রকাশরূপে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় করে আত্মসমর্পণ করিতে অধীরা, কিন্তু পিতা সত্যসিন্ধু স্থির করিয়াছেন পরীক্ষা না করিয়া কাহারও সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন না। কলিকাতার একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে অলীকপ্রকাশ পরীক্ষা দিতেছেন। সত্যসিন্ধু বাবু সকল সহিতে পারেন কিন্তু মিথ্যা কথা তাঁহার সহ্য হয় না। অলীকপ্রকাশের মুখ দিয়া একটিও সত্য কথা বাহির হয় না। অলীকপ্রকাশ একটি মিথ্যাকে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অপর একটি মিথ্যা কথার আশ্রয় লইতেছেন—এইরূপে অনর্গল মিথ্যা কহিয়া যাইতেছেন। এক-এক সময় মহাসঙ্কটে পড়িতেছেন, সেই সময়ে হেমাঙ্গিনীর দাসী প্রসন্নর পাণি-প্রার্থী গদাধর ছদ্মবেশে আসিয়া কোনও প্রকারে তাহার মিথ্যা উক্তিগুলি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। যখন অলীকপ্রকাশ সত্যসিন্ধুকে প্রতারণা করিয়া প্রায় তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থনায় সফল হইয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার সকল বাক্যের অলীকতা প্রমাণিত হইয়া গেল এবং অলীকপ্রকাশ

"এমন কর্ম্ম আর করব না" বলিয়া নাকে খৎ দিলেন।

এই প্রহসন খানির প্রত্যেক পংক্তি পাঠ কালে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বঙ্কিমের নভেলি বাঙ্গালার যে সকল ব্যঙ্গানুকৃতি আছে তাহা যথার্থই উপভোগ্য। একস্থানে হেমাঙ্গিনী তাঁহার দাসী প্রসন্নকে নভেল পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন :—

"এখনও প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। এখনও ক্ষীণচন্দ্র নৈশ-গগনপ্রান্তে, সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল, হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল। ক্রমে উষার দুই-চারিটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল—পুষ্প-কলিকা দুই-চারিটী ফুটিয়া উঠিল—গাছের দুই-চারিটি পাতা নড়িল। প্রথমে একটি পক্ষী ডাকিল, তারপর দুইটি পক্ষী ডাকিল, পরে তিনটি পক্ষী ডাকিল—শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। কুঞ্জে-কুঞ্জে পক্ষীর কলরবের সহিত গৃহে গৃহে ঝাঁটার কলরব উঠিল। এই দুই কলরব মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রভাত-সঙ্গীত সৃজিত হইয়া প্রাভাতিক গগনে সমুত্থিত হইল। সকলই

নিস্তব্ধ—কেবল একটি মাত্র অশ্বারোহী পুরুষ জনশূন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার অশ্বের পদ-শব্দে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে—ক্রমে সেই অশ্বারোহী পুরুষ একটি গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন; দেখিলেন, বংশীবদন ঘোষের বাড়ির গৃহস্থেরা সকলেই নিদ্রিত। কেবল একটি মাত্র বালিকা সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিল। সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা তাহা কি পাঠকগণ দেখিয়াছেন?—কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি। ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে। বজ্র ও বিদ্যুতে প্রখরে মধুরে মিশে; নিদাঘ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে; ব্রাণ্ডি ও বরফে প্রখরে মধুরে মিশে; চীলের চিহিঁ রবে ও কোকিলের কুহুধ্বনিতে প্রখরে মধুরে মিশে; এবং বালিকার সুকুমার হস্তে ঝাঁটিকাও প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে!—হে শতমুখি!—হে ধূমকেতুপ্রতিরূপিণি সম্মার্জ্জনি!—হে কুণ্ডলাকৃতি ধূলিরাশিসমুদ্দ্যারিণি!—হে শল্মল-কণ্টকী-নিন্দিত-তীক্ষ্ণকর-প্রসারিণি!—হে নারিকেল-রশি-নিবদ্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কিবা তোমার অতুলনা মহিমা! তুমি গৃহের শ্রীস্বরূপা, কারণ তুমি

গৃহ-প্রাঙ্গণের মুখ উজ্জ্বল কর—তুমি পল্লীর বৈতালিক-স্বরূপা, কারণ তুমি মৃদু মধুর ঝর ঝর নিনাদে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ কর—তুমি বিপত্নীক ভর্ত্তার ভীতিস্বরূপা, কারণ দিবা-রাত্রি তাহার উপর নিগ্রহ কর—তুমি বীরত্বের আদর্শ-স্বরূপা, তোমার সহিত সম্মুখযুদ্ধে কেহ অগ্রসর হয় না, কারণ তোমা কর্ত্তৃক নিগৃহীত ভীরুদের পৃষ্ঠদেশেই ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হয়—তুমি অলঙ্কার-শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্যস্বরূপা—কারণ তোমাতে নব-রসেরই আবির্ভাব। যখন আনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর সুকুমার হস্তে তুমি শোভমানা হও, তখন তুমি আদিরসের উত্তেজক—যখন প্রচণ্ডমূর্ত্তিধারিণী, ঘূর্ণায়মান-লোচনা, আলুলায়িত-কেশা, বদ্ধপরিকরা বাগান্তবর্ষিণী প্রৌঢ়ার হস্তে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া থাক, তখন তুমি রৌদ্র বীর ও ভয়ানক রসের উত্তেজক এবং যখন তোমার সেই সুতীব্র ভীষণ বজ্র নিগৃহীত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ শতধা বিদীর্ণ করিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করে, তখন তুমি করুণ-রসের উত্তেজক—যখন আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনারাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাক তখন তুমি বীভৎস রসের উত্তেজক—যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়-কের কোপশান্তি হয় তখন তুমি শান্তিরসের উত্তে-

জক। তোমার মহিমার অন্ত কোথায়?—তোমাকে প্রণাম।"

উপরিউদ্ধৃত অংশে ঝাঁটার মহিমাকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে বিষবৃক্ষের দশম পরিচ্ছেদে হুঁকার প্রশংসা-কীর্ত্তন মনে পড়ে।

আর একস্থলে অত্যধিক নভেল পাঠে বিকৃত-মস্তিষ্কা হেমাঙ্গিনী, দাসীর সাহায্যে অলীকপ্রকাশকে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিতেছেন!—

"স্বামিন!—

কি বলিলাম? আমি কি এখন আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিতে পারি?—কে বলে পারি না?—অবশ্য পারি। সমাজ ইহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার নিন্দা দেশ বিদেশে পরিঘোষণা করিতে পারে, পিতা মাতা আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ মধুর সম্বোধন করিতে কেহই আমাকে বিরত করিতে পারিবে না। আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব তুমিই আমার স্বামী; শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষবার বলিব তুমিই আমার স্বামী। যে অবধি আমাদের গবাক্ষ দ্বার দিয়া তোমার

সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখিলাম—সেই মুখখানি—সেই উষার প্রথম কিরণের ন্যায় মুখখানি, সায়াহ্নের প্রথম তারার ন্যায় মুখখানি, প্রেমের প্রথম আলাপের ন্যায় সেই মুখখানি দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলিলাম—জ্বলিয়া মরিলাম না কেন?—আর পারি না—পত্রের প্রতি ছত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে—কত পত্র লিখিলাম, অশ্রুজলে মুছিয়া গেল—আবার মুছিয়া গেছে—আবার লিখিয়াছি—আর পারি না—অশ্রুজলে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—এইবার বিদায়—এইবার শেষ বিদায়—জন্মের মত বিদায়। যদি এই নারীজন্মে বিধাতা এমন দিন লিখিয়া থাকেন, তবে একবার তোমার সেই মুখখানি দেখিব—নয়ন ভরিয়া দেখিব—দেখিতে দেখিতে মরিব। জীবনে আর আমার কোন সাধ নাই।

তোমারি হেম।"

• উপরি-উদ্ধৃত পত্রের এক-এক স্থান পাঠ করিতে করিতে চন্দ্রশেখরের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর কথা মনে পড়ে।

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দুই-একটি সঙ্গীতেও চমৎকার ব্যঙ্গানু-

কৃতি পরিদৃষ্ট হয়। গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর গানে' সুন্দরের উক্তি—

"গা তোলরে নিশি অবসান (প্রাণ)
বাঁশ বনে ডাকে কাক, পূর্ব্ব দিক হ'লো ফাঁক্
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ॥
আজিকার মত আসি, উঠ ওলো প্রাণ-প্রেয়সী !
স্বস্থানেতে গেল শশী, জাগিল সব প্রতিবেশী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, কোকিল করে গান ॥"

এই ভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়াছে—

"গা তোলরে নিশি অবসান, প্রাণ।
বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁই শাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।"

"জানকীর প্রতি শ্রীরামের নিম্নলিখিত উক্তি"টিও 'রামিয়াড' রচয়িতার অনুপযুক্ত হয় নাই ঃ—

"গা ঢালোরে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
'বেল ফুল' 'বেল ফুল' ঘন হাঁকে মালিকুল,
'বরীফ্' 'বরীফ্' হেঁকে বরফ্-ওলা যান।

শ্যাওড়া বনে প্যাঁচা পাল, ক্যাকা হুয়া ডাকে শ্যাল,

আঁস্তাকুড়ে কিচিব মিচিব ছুঁচোয় করে গান।

হুলো বেড়াল মিয়াও কোবে, নেংটে ইঁদুর খাচ্চে খোবে

পেঁচা ভাবে আমাব খাবার অন্যে কেন খান।

পড়্‌ল গুড়ুম নটাব তোপ, এখনও কি যায়নি কোপ,

একটুখানি দিয়ে হোপ্‌ রাখ্‌লো আমার প্রাণ।

ভোঁদড়গুল মারচে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকাখুকি,

শ্রীবাম বলেন হে জানকী ভাংবে কি তোব মান?

দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাংবার নয়,

চরণ ধরহে দয়াময়, নহলে নাইকো ত্রাণ।"

এই অপূর্ব্ব প্রহসনখানি প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব বাটিতে এবং পবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই হইতে যখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তখনই তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে লইয়া কোনও এক আনন্দ উৎসব করিতে ভালবাসিতেন। এই সকল উৎসবের কল্পনা করিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তিনিই এই সকল অনুষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। 'অলীক বাবু' এবং আরও অনেক প্রহসনাদি এই সকল উৎসব উপলক্ষেই অভিনীত হয়। 'এমন কর্ম্ম আর করব না'র প্রথম অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অলীকপ্রকাশ সাজিয়া

ছিলেন। মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার মুখে শুনিয়াছি, এই অভিনয়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী 'শুভ-বিবাহ'-রচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণী নায়িকা 'হেমাঙ্গিনীর' ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সুধীশ্রেষ্ঠ প্রিয়নাথ সেন মহাশয় এই প্রহসন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবঃ—

"আমি 'অলীক বাবু'র প্রথম পরিচয় পাই অভিনয়-মঞ্চে। সে আজ অনেক দিনের কথা। এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবি বাবু অলীক প্রকাশ সাজিয়াছিলেন। যাঁহারা রবি বাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে। যিনি সত্যসিন্ধু বাবু সাজিয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয় চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অপরাপর পাত্রদিগের অভিনয়ও অতিসুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। অভিনয়ের গুণে রসহীন, অকিঞ্চিৎকর নাটকও মনোহর হইয়া উঠে। এমন অনেক নাটক আছে, রঙ্গমঞ্চে যাহাদের খুব আদর, কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু কেবল মাত্র অভিনয়চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া

৺শরৎকুমারী চৌধুরাণী

আমি প্রথম পরিচয়ে অলীক বাবুর অনুরক্ত হইয়া পড়ি নাই। গ্রন্থকারের অট্টহাস্যময়ী রঙ্গিণী কল্পনার উল্লাস-লাঞ্ছিত লাস্য-লীলাতরঙ্গে হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল। ইহার ভিতর একটি নিতান্ত অভিনবরস উপভোগ করিয়াছিলাম। আমাদের সাহিত্যে ইহা একটি নূতন সামগ্রী। বাঙ্গালায় অনেকগুলি সুন্দর প্রহসন আছে—'একেই কি বলে সভ্যতা', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির কৌলীন্য-গৌরব কে না স্বীকার করে? হালের আমলে 'বিবাহবিভ্রাট' সম্বন্ধে কোনওরূপ মতবিভ্রাট নাই। ইহারও উপাদেয়তা সর্ব্ববাদিসম্মত।

"কিন্তু 'অলীক বাবু' ইহাদের সকলগুলি হইতে স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ, ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজবিশেষ প্রহসনের লক্ষ্য হইয়া থাকে। সমাজের কোনও কুপ্রথা বা কুরীতি, ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন দোষ বা গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া, তাহার হাস্য-জনক, বিদ্রূপা-ত্মক বিকাশই প্রহসনের কার্য্য। আমরা যে কয়েক-খানি প্রহসনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদেরই ভিতর প্রহসনের এই ধর্ম্ম বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় পূর্ব্বতন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট, ইংরেজানুকরণপ্রিয়, আমোদরত বঙ্গ-

যুবকের 'বেলেল্লাগিরির' হাস্য-জনক চিত্র। ঐ সকল গুণই বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহমধ্যে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে বিবিধ বর্ণে পরিস্ফুট করিয়া 'সধবার একাদশী' রচিত। ইংরাজী শিক্ষায় দীক্ষিতা, জাতীয় ভাব-বিচ্যুতা বঙ্গনারীর সহিত শিক্ষাহীন চরিত্রহীন বঙ্গযুবকের পরিণয় অবস্থা-বৈচিত্র্যে কিরূপ হাস্যজনক হইয়া থাকে, 'বিবাহ-বিভ্রাট' তাহারই উজ্জ্বল কল্পনা। কিন্তু সমালোচ্য প্রহসনে এরূপ কোন ব্যঙ্গ বা অপর উদ্দেশ্য নাই। ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সরল, উজ্জ্বল, বালক-সুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি—নিছক বিশুদ্ধ হাসি। কল্পনা উদ্ভট হইলেও সুস্থ অবিকৃত বালক-হৃদয়ের কল্পনা। এই আনন্দোচ্ছল, সরল অথচ উদ্ভট কল্পনাতেই গ্রন্থের গৌরব—গ্রন্থকারের প্রতিভা।

* * * *

"এই অপূর্ব্ব কল্পনা হাস্য-রসিকের সৃষ্টি। সাহিত্যে ইহা বিরল। বঙ্গ-সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক মোলিয়ের তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকে এইরূপ হাস্যময়ী কল্পনার অবতারণা

করিয়াছেন। এ কল্পনার ভিতর কোন বিশাল বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের গূঢ় ছায়া বা নিগূঢ় অভিসন্ধি নাই। হাসিতেও কোন জ্বালা নাই। না থাকিলেও—বা নাই বলিয়াই, ইহা অমূল্য। ইহার প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। এই স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হাসি জাতীয়-জীবনের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক—কল্যাণকর—শোভাবিধায়ক। ইহা মুক্ত বাতাসের ন্যায় জীবনে বল ও স্ফূর্ত্তি আনিয়া দেয়, কর্ম্ম-পীড়িত দেহের অবসাদ তিরোহিত করে এবং চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটের ভ্রুকুটি-বন্ধন খুলিয়া দেয়। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই নিরানন্দ বাঙ্গলায় এখনও এমন রঙ্গময়ী প্রতিভা বর্ত্তমান, আমাদের ভিতর এমন লোকও আছেন যাঁহার আনন্দোদ্বেল হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে এমন হাস্যময়ী কল্পনার তরঙ্গ বাহির হইয়াছে। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, 'অলীক বাবু' যে কোন লেখকের প্রতিভা গৌরব বাড়াইবে, এবং যে কোন সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবে।"

অশ্রুমতী। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী'র ন্যায় আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। গ্রন্থ-

খানি ইংলণ্ড-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসৃষ্ট হয়। উৎসর্গ-পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভাই রবি,

তুমি অশ্রুমতীকে দ্যাখ্‌বার জন্য উৎসুক হ'য়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে, তা হ'লে আমি সুখী হব।

৯ই শ্রাবণ
১৮০১ শক

তোমার"

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন —

"ভাই জ্যোতি দাদা,

ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন

রবি।"

নাটকখানির আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই :—

সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ একদা চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। মানসিংহ তাঁহার ভগিনীকে মোগলের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্র ভোজনে সম্মত হন নাই। ইহাতে মানসিংহ অপমান বোধ করিয়া আকবরকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং স্বয়ং যুবরাজ সেলিমের সহিত যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রতাপ পরিবারসমভিব্যাহারে পর্ব্বত-কন্দর হইতে পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় লন। একদা তাঁহার অনুপস্থিতিতে মানসিংহ প্রতাপের কন্যা 'অশ্রুমতীকে' ফরিদ নামক জনৈক মুসলমান দ্বারা অপহরণ করিয়া লইয়া যান এবং উভয়ের বিবাহ দিয়া প্রতাপের কুলগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ অশ্রুমতী সেলিমের নয়ন-পথে পতিত হওয়ায় তাঁহার সে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। সেলিম অশ্রুমতীকে তাঁহার পদোচিত সম্মানের সহিত রাখেন। সেলিমের প্রতি অশ্রুমতীর কৃতজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সেলিমও অশ্রুমতীর অনুরাগী হইয়া পড়েন। প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া মোগল শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভ্রাতার কুল-গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বিবাহে বাধা প্রদান করেন এবং অশ্রুমতীকে প্রতাপের নিকট লইয়া যান।

প্রতাপ তখন মৃত্যু-শয্যায় শয়ান। তিনি অশ্রুমতীকে কলঙ্কিনীজ্ঞানে বিষপানের আদেশ দেন। পরে শক্তসিংহ অশ্রুমতীর নির্দ্দোষিতা ও শুচিতা সপ্রমাণ করিলে মহারাণা তাঁহাকে যোগিনী ব্রতে দীক্ষিত হইয়া চিরকুমারী থাকিয়া মহাদেবের ধ্যান করিতে আদেশ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অশ্রুমতীও আজীবন কুমারী থাকিয়া পিতার আদেশ পালন করেন।

এই নাটকখানি বহুবার 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত হইয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। এই নাটকের অন্তর্গত কতকগুলি প্রেমগীতি, 'প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে, সেই হন্তারক প্রাণে', 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন', 'প্রেমের কথা আর বোলো না'—এখনও বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং এই সকল গীত ব্যতীত কোনও বাঙ্গালা সঙ্গীত-সংগ্রহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে পারা যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু-বিক্রম', 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'—সকল নাটকই হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং ভারতের নানাস্থানে অভিনীত-হইয়াছিল। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনায় অভিনয়-কালে, গ্রন্থকার প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের

কন্যাকে সেলিমের অনুরাগিণী করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে ক্ষুব্ধ এবং নাট্যকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এমন কি, কেহ কেহ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠেন। কলিকাতা-প্রবাসী অনেক রাজপুত ক্ষত্রিয়ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। অনেকেই গ্রন্থকারকে এ সম্বন্ধে নানা পত্র লিখিয়া অনুযোগ করেন। আমরা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কাগজ-পত্রের মধ্যে (তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী, এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহা-শয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে) প্রাপ্ত কতকগুলি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

Barabazar Library
203 Harrison Road.
Calcutta, the 25th. September, 1901.

From Pandit Kesab Prasad Misra
Honorary Secretary to the Barabazar Library

To
Babu Jotirindra nath Tagore
Jorasanko

Dear sir,

Myself and several prominent members

of the Library have carefully gone through your book entitled 'Asrumati' and find therein, to our great astonishment, that Maharana Pratap Singh, the greatest of the Hindu sovereigns, had a daughter in the person of Asrumati, who deeply fell in love with a Mahomedan prince. Would you please let us know the source from which you have got your information in connection with it.

Yours truly

(Sd) Kesab Prasad Misra

Hony. Secretary to the Barabazar Library

(২)

Barabazar Library

203 Harrison Road,

Calcutta, 30th September, 1901.

From

Pandit Kesab Prasad Misra

Hony. Secretary to the

Barabazar Library

To

Babu Jyotirindra Nath Tagore

Calcutta

Dear Sir,

Whilst much admiring the style, diction and poetry of your drama 'Ashrumati' I am constrained to say that it is not proper to associate prominent historical characters with matters quite foreign to them. Everything has its limits, and even dramatic & poetical imagination with its great latitude is no exception to it. Considering the great regard which the Rajputs have for their religion and the spirit of exemplary independence possessed by the great Maharana Pratap Singh, the story of his alleged daughter Ashrumati's love for the Mahomedan prince Salim, based upon pure imagination is a slur cast on the sacred memory of the Maharana, who has been highly revered by

the Hindu society. In the eyes of many persons reading the drama, the noble and lofty ideas and notions, rightly entertained and cherished by them, towards that great Rajput are apt to be sullied; and in the interest of history and justice, it is highly desirable that nothing should be done to lower him in the estimation of the Hindu public. I trust that you will please see your way to stop either further publication of the book or to substitute some fictitious character in the place of the much esteemed name of Maharana Pratap Singh.

Yours truly
Kesab Prasad Misra
Hony. Secy. to the Barabazar Library,

"ভারতমিত্র" পত্রের সম্পাদকও তৎসম্পাদিত পত্রে প্রকাশিত 'অশ্রুমতী'র একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রেরণ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উক্ত মর্ম্মে পত্র লিখিয়া-

প্রৌঢ়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

পৃঃ—৮১
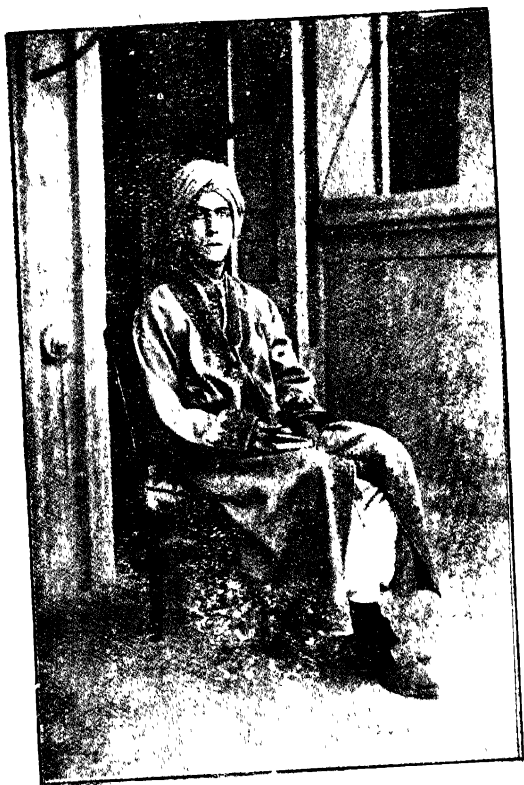
ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

(৩)

১ অক্টোবর ১৯০১।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "ভারতমিত্র" পত্রিকায় "অশ্রুমতী'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা আমি পাঠ করিলাম এবং তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা নিম্নে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ইহার অনুবাদ কিম্বা মর্ম্মার্থ "ভারতমিত্রে" প্রকাশ করিলে পরম বাধিত হইব।

মহারাণা প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশ-ভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি স্বীকার করি, "অশ্রুমতী" বলিয়া প্রতাপ সিংহের কোন কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনা মাত্র। আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতাপ সিংহের চরিত্র-গৌরব

কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন প্রতাপ সিংহ আসন্ন মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া শক্তসিংহের নিকট শুনিলেন যে সেলিম পাপ-হস্তে অশ্রুমতীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, তখন তিনি তাহার প্রাণনাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রুমতীর মনেও পাছে কোন কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া থাকে—এই আশঙ্কায় তিনি তাকে চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

আর এক কথা। যদি বলেন, রাজপুত-মহিলা হইয়া অশ্রুমতী কি করিয়া একজন বিধর্ম্মী মুসলমানকে ভাল-বাসিল, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই ;—অশ্রুমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলদের নিকটে থাকায় এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায়, নিজের কুলধর্ম্মজ্ঞান তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল ; সে জানিত না—কে রাজপুত, কে মুসলমান। সেলিম তাহাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বা-ভাবিক নহে। এবং কি অবস্থায় পড়িয়া অশ্রুমতী রাজ-

পুত্র মহিলার অযোগ্য কাজ করিয়াছিল, তাহা যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অশ্রুমতীকেও দোষ দেওয়া যায় না। আর এক কথা, অশ্রুমতী সেলিমকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল—শুধু ইহাতেই প্রতাপ সিংহের কুলে কলঙ্ক আসিতে পারে না। এবং মনে মনে ভালবাসাতেও যদি কিছু কলঙ্ক হইয়া থাকে, অশ্রুমতী চিরকুমারী-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় প্রতাপ সিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এই নাটকের প্রতি লেখকের যেরূপ আন্তরিক বিদ্বেষ ও বিরাগ তাহাতে বলিতে সাহস হয় না, আর একবার যেন তিনি এই নাটকখানি ধীরভাবে পড়েন—আমার বিশ্বাস, আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে, তিনি আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এই নাটকে ঐতিহাসিক ভুল ও অসংলগ্নতা থাকিতে পারে; কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপসিংহের উপর আমার যে শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

ভবদীয়

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠকগণ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন বলিয়া আর একখানি পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভূমিকায় বিশদ ভাবে সকল কথা বুঝাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করেন। উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর 'ভারতমিত্র' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

(৪)

The "Bharat Mitra" Office

Established 1878

Telephone No. 137

97 Muktaram Babu's street

Calcutta, the 8th Oct. 1901

To

Babu Jyotirindra Nath Tagore

19 Store Road, Ballygunge, Calcutta

Sir

I cannot sufficiently thank you for your desire to amend the wrongs your work the "Asrumati" has caused to the Hindus of Rajputana and Upper India, To err is no doubt human, but to admit it when shewn and

correct it when fully convinced are rare qualifications of great men only. By this noble sacrifice you have proved yourself worthy—of this latter class. With these few words of thanks for your laudable wish, which will no doubt be brought into action in the near future,

I remain
Yours ever faithfully
Balmukund Gupta
Editor "Bharata Mitra"

পণ্ডিত কেশবলাল মিশ্রের পত্রের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ লিখিয়াছিলেন :—

(৫)

"মান্যবরেষু

আপনার ১৭ অক্টোবরের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার পত্রের উত্তর বাঙ্গালায় লিখিতেছি ; কেন না, ইংরাজি ভাষায় আমার তেমন অধিকার নাই। তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন, সেলিমের সহিত অশ্রুমতীর

ভালবাসা হওয়ায় প্রতাপ সিংহের শুভ্র যশে কলঙ্ক পড়িয়াছে। কিন্তু আপনারা যদি প্রণিধান করিয়া নাটকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, আমি এই ভালবাসার বিশুদ্ধতা বরাবর রক্ষা করিয়াছি—শারীরিক স্পর্শে ইহাকে দূষিত হইতে দেই নাই।

চতুর্থ অঙ্ক ১৭৮ পৃষ্ঠা—

"সেলিম।—দেখ যেন প্রতাপ সিংহ তার দুহিতাকে কলঙ্কিত মনে না করেন—আমি শপথ করে বলচি ও পবিত্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ হস্তের কখন স্পর্শ পর্য্যন্ত হয়নি।"

বিবাহ হওয়া দূরে থাক্ শারীরিক স্পর্শও হয় নাই। এঅবস্থায় প্রতাপ সিংহের কুলমর্য্যাদার কি কোন হানি হইতে পারে?—বিন্দুমাত্র নহে।

পঞ্চম অঙ্কের ১৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—উহাতে সমস্ত প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রতাপসিংহ অশ্রুমতীকে বিষ খাওয়াইতে উদ্যত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহ প্রবেশ করিয়া প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিলেন—

"প্রতাপ।—কি বল্লে শক্ত সিংহ?—আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি?

শক্ত সিংহ।—না, মহারাজ হয়নি। সেলিম যে রকম যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, তাতে কোন্ সরলা বালার মন আর্দ্র না হয়? কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি—আব তরবারি স্পর্শ করে শপথ করতে পারি, সেলিম কর্তৃক অশ্রুমতীর কোন অসম্ভ্রম হয় নি—শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার সে কথা স্বীকার করতে হবে—এ আপনাকে আমি শপথ করে বলচি—কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রু-মতীকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নি—আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন।

প্রতাপ।—আ! আ! শক্তসিংহ! ভাই! তোমার কথায় তবু একটু আশ্বস্ত হলেম। অশ্রুমতি! এইদিকে এস। আমি যতদূর আশঙ্কা করেছিলেম, ততদূর বাস্তবিক নয় শুনে তবু নিরুদ্বিগ্ন হলেম। কিন্তু এখন আমার আর একটী কথা বলবার আছে—অশ্রুমতি, সেই কথাটি যদি রক্ষা কর, তাহলে আমি এখন সুখে মরতে পারি।

অশ্রু। বল বাবা—আমি তা রক্ষা করব।

প্রতাপ। পুরোহিত!

পুরোহিত। মহারাজ!

প্রতাপ। অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষিত কর—চিরকুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক—মনেও যদি কোন কলঙ্ক স্পর্শ হয়ে থাকে তাও অপনীত হবে—যাও নিয়ে যাও।"

তবে যাঁহারা মনে করেন, এই ভালবাসার কথা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য পুনর্মুদ্রণের সময় এই বিষয়ে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি। ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিষ নহে। কোন দেশের কোন নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হয় না।

যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে?—দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিল *—সে জানিত না—রাজপুত কে মুসলমান কে। যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?"

এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অশ্রুমতীর নূতন সংস্করণে একটি ভূমিকায় এ সকল কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ১৩২৭ সালে প্রকাশিত অশ্রুমতীর

* "ভাগ্যি তোমরা তাকে জবরার টিনখনিতে লুকিয়ে রেখেছিলে।"

অষ্টম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিম্নোদ্ধৃত 'কৈফিয়ৎ' ভূমিকা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের অশ্রুমতী নাম্নী কোন কন্যা ছিল কি না এবং অশ্রুমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিকই কোন প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন—

রাণা প্রতাপসিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিন খনির মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয়। এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক কিম্বা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি। বাকী সমস্তই কপোলকল্পিত। 'অশ্রুমতী' নামও মৎ-প্রদত্ত। এইরূপ নিরাশ্রয় বালিকার সৈনিকদিগের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ঘটনা নহে। তাহার পর সেলিম উহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়া সেলিমের প্রতি ঐ বিমূঢ়া সরলা বালা যে কৃতজ্ঞ হইবে এবং সেলিমের যত্নাতিশয্যে এ কৃতজ্ঞতা যে ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইবে, তাহাতেও আশ্চর্য্য নাই। ইহা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম। বলা বাহুল্য, স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মানবপ্রকৃতির

কিরূপ বিকাশ ও পরিণাম ঘটে তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য কার্য্য। কোন মুসলমানের প্রতি হিন্দু ললনার অনুরাগের কথা শুনিয়া কেহ কেহ আঁৎকিয়া উঠেন। যেন এরূপ ঘটনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যেন এরূপ কেহ কখনও শুনে নাই, যেন ইতিপূর্ব্বে কোন উপন্যাসেই এরূপ ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। তবে যদি কেহ বলেন, রাণা প্রতাপসিংহের দুহিতাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাণার শুভ্র যশকে কলঙ্কিত করা উচিত হয় নাই—তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য—যিনি অশ্রুমতী নাটক ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, যাহাতে রাণা প্রতাপসিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি। যথা—

"প্রতাপ। কি বল্লে শক্তসিংহ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি?

শক্ত। আমি বিলক্ষণ জানি—আর তরবারি স্পর্শ করে বলতে পারি—সেলিম কর্ত্তৃক অশ্রুমতীর কোন অসম্ভ্রম হয় নি—শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার এ কথা স্বীকার করতে হবে। এ আপনাকে আমি শপথ করে

বলছি—কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নি—আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন।”

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া প্রতাপ সিংহ বিষপ্রয়োগের আদেশ রহিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কঠোর যোগিনী-ব্রত পালনের আদেশ করিলেন।

“শক্তসিংহ—ওর মনেও যদি কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে—আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও ওর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাই নে।”

অতএব দেখা যাইতেছে, এইরূপ আদেশ করিয়া রাণা প্রতাপসিংহ স্বকীয় শুভ্র যশকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং অশ্রুমতীর আচরণ হইতে ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে—অশ্রুমতীর স্বর্গীয় প্রেমে কোন পার্থিব কলঙ্কের স্পর্শমাত্র হয় নাই।

নিবেদক—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কেহ কেহ অশ্রুমতীর ‘হিন্দী সংস্করণ’ প্রচার বন্ধ করিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৬)

Bharat-Jiwan Office
Old Chowk
Benares City 29-10-1901

Ramkrishna Varma
Commisson Agent, Proprietor
and Publisher, Bharat Jiwan.

মান্যবর মহাশয়,

আমরা হিন্দী সাহিত্য সেবার নিমিত্ত প্রায় অন্যান্য ভাষা হইতে উত্তমোত্তম পুস্তকগুলির হিন্দী অনুবাদ করিয়া থাকি—অনেকগুলি পুস্তক এরূপ প্রকাশ করিয়াছি। আপনার রচিত "অশ্রুমতী" নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে।

আপনার 'সরোজিনী নাটক' এক মহাশয় হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন—এ বহুদিনের কথা। বাজারে আর বই পাওয়া যায় না। এ নিমিত্ত আমি অনুবাদককে লিখিয়াছিলাম—উনি অনুগ্রহ করিয়া

আমাকে পুনঃ ছাপাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রার্থনা যে যদি মহাশয়ও আজ্ঞা প্রদান করেন তাহা হইলে আরও উত্তম হইবে; কারণ ইহা প্রকাশ হইলে আপনার কীর্ত্তি হিন্দী-সমাজেও প্রকাশিত হইবে। প্রতি-উত্তর একান্ত প্রার্থনীয়।

বশম্বদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ম্মা।

পুনঃ

1 গাজীপুরের মোখত্যার লালা উদিত নারায়ণ লালকে আপনি 'অশ্রুমতী'র অনুবাদ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিজের খরচে ছাপাইয়াছিলাম।

2 'সরোজিনী'র প্রথম অনুবাদে অনেক ভাষার দোষ রহিয়াছে, এবারে তাহাও শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

রাম।

'অশ্রুমতী' লইয়া এই আন্দোলন আরও অনেকদিন চলিয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন :—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(৭)

195 Cornwallis Street
Nov. 30th. 1903.

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, আপনার সহিত সাক্ষাৎও নাই। বোধ হয় ৺কৃপায় আপনার কায়িক কুশল আছে। এ পক্ষের সকল কুশল জানিবেন।

একটা কথা বলিবার আছে। গত কল্যকার তারিখের "রঙ্গালয়" পত্রে দুইটি প্যারা আছে, উহাতে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের দায়িত্বের কথা তুলিয়া আপনার 'অশ্রুমতী'র কথাও লেখা আছে। ব্যাপার এই যে, 'রাজস্থান সমাচার' নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার 'অশ্রুমতীর' কথা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রুমতীর অনুবাদ হইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয় কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে। যে সকল হিন্দুস্থানী লেখক-বন্ধু বাঙ্গালীর পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলিতেছেন যে, আপনি যদি সোজা মহারাণা

উদয়পুরকে পত্র লিখিয়া ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে নূতন সংস্করণ করিতে হইলে অশ্রুমতীর ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের আন্দোলনটা একেবারেই নিভিয়া যায়। উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ বাহাদুর বড়ই যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলে জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে শান্ত রাখিতে পারেন। রাজস্থানে একটা ক্ষত্রিয়-সভা হইয়াছে। এই সভার সদস্য 'রাজওয়াড়ার' সকল করদ নৃপতি; এই সভার প্রতাপও খুব। বাঙ্গালী-বিরোধের আন্দোলনটা এই সভাই গ্রহণ করিয়াছে। তাই আশু কুফল ফলিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা। রাজস্থানের বাঙ্গালী চাকুরেদের মধ্যেও এমন আশঙ্কা খুব হইয়াছে। আপনি বাঙ্গালীর শিরোমণি—বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলকামনা আপনি করিয়া থাকেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে আপনি নানাবিধ ত্যাগস্বীকারও করিতে পারেন, বিশেষ, আমার আপনার উপর একটু আব্দার চলে; তাই সাহস করিয়া এত কথা লিখিতে পারিতেছি। সত্য বটে, নাটকের হিসাবে 'অশ্রুমতী'তে কোন দোষ নাই, সত্য বটে নাটককারের সকল দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা

আছে, সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় করেন নাই, তথাপি যখন একটা অছিলা ধরিয়া দুষ্ট হিন্দুস্থানী লেখকগণ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিদ্বেষের উদ্গার করিতেছে, তখন একটু সাবধান হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরই পক্ষে শ্লাঘার কথা হইবে, জানিবেন। আমি শুনিলাম যে, পূর্ব্বে আপনি উদয়পুরের কোন এজেণ্টের নিকট স্বীকার পাইয়াছিলেন যে, অশ্রুমতীর নূতন সংস্করণে আপনি ভাব বদ্‌লাইয়া দিবেন। বোধ হয়, হিন্দী বঙ্গবাসীতে ও ভারতমিত্রে এ কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল। যদি আমার খবর ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন অনুমান করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে না যে, আপনি মহারাণা বাহাদুরের নিকট ক্রটি স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ভাষায় রাণা প্রতাপবংশাবতংস বর্ত্তমান মহারাণা ফতেহ্ সিংহ মহোদয়ের নিকট ক্রটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না। বিশেষ যখন এইরূপ করিলে একটি প্রবল জাতি সম্প্রদায়ের amour proprer পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সদ্ভাবের সূচনা করা হইবে, তখন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করিতেই পারেন না।

মহারাণা বাহাদুরকে সরাসরী আপনি পত্র লিখিলে হয় ত তাঁহার হস্তগত না হইতে পারে। আপনি যদি ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন ত' আমাকে বলিবেন, আমি যোগ্য লোকের দ্বারা আপনার পত্র 'খোলা দরবারে' মহারাণার হস্তগত করাইয়া দিতে পারিব; এবং যাহাতে আপনার মর্য্যাদানুসারে রাণা-দরবার হইতে পত্রোত্তর ও অভিবাদন আপনার হস্তগত হয়, সে পক্ষেও যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনি জানিবেন যে, ত্রুটি স্বীকার করিলে হিন্দুস্থানী সমাজে তথা মহারাণার দরবারে আপনার মান-সম্ভ্রমের বৃদ্ধিই পাইবে। আমি 'সাহিত্য-পরিষদের' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। যদি বাঙ্গালী সুধীমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও এই ব্যাপার লইয়া মহারাণার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা রাজস্থানে বাড়িয়াই যাইবে।

আমার পত্রের উত্তর দিবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন ত আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে পারি। অনেকদিন দেখা শুনা নাই, একবার দেখা করিলেও কোন অ-লাভ নাই। ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাগজ-পত্রাদির মধ্যে উপরি-উদ্ধৃত পত্রের নির্দ্দেশমত উদয়পুরের মহারাণাকে লিখিত একখানি পত্রের খসড়া পাওয়া গিয়াছে। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

19 Store Rd., Baligunj.

To

H. H. the Maharana of Oodeypore

etc. etc.

Your Highness,

It has been brought to my notice lately that a certain Bengali drama of mine called "Ashrumati," which was published by me about 25 years ago, has had the misfortune to incur the displeasure of a section of the Rajput community, on account of an imaginary love-episode introduced by me between Ashrumati, a fictitious daughter of Rana Pratap Singh and Selim, son of Akbar,

I beg to be allowed to tell you, who are the head of the Rajputs, and the one who can claim to be most interested in the matter,—that nothing could have been farther from my thoughts than to cast the slightest slur on the illustrious fame of Pratap Singh, the hero of the whole of Hindustan. On the other hand, I have endeavoured in my drama to portray his character in all its greatness and nobility.

The episode alluded to is slight enough in itself as your Highness may see for yourself if you deign to glance over the book, and is also purely imaginary. Nevertheless, if I have, however unwittingly hurt the feelings of the Kshatriya community of India in any way,—all I can say is that I am exceedingly sorry—and that I am willing to do all that is possible for me to re-

move any misconception there may exist in this connection.

I have the honor to be
Your most obdt. Servant

পত্রখানি মহারাণার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল কি না এবং যদি হইয়া থাকে উহার কি প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই।

সুধীশ্রেষ্ঠ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'অশ্রুমতী' পাঠ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা অশ্রুমতী-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনার 'অশ্রুমতী' পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। 'সরোজিনী'র ন্যায় ইহাতেও ভাষার সরলতা ও মধুরতা এবং গল্পের রচনা-নৈপুণ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহাতে চিত্রিত চরিত্র-গুলির স্ব-স্ব দোষগুণ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতাপসিংহের বীরোচিত স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও স্বদেশানুরাগ, শক্তসিংহের ভ্রাতৃভক্তি, সেলিমের উদারতা ও ভীলজাতির সরলতা অতি উজ্জ্বলরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। সরলভাবে বলিতে গেলে পৃথ্বীরাজের চরিত্রটি আমার তত

ভাল লাগে নাই। তিনি কবি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু এত প্রণয়ে চপলতা ও মলিনার প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার কবির যোগ্য কোন মতেই হয় নাই। প্রতাপ সিংহের কন্যা হইয়া অশ্রুমতীর যবনের প্রতি প্রণয় হওয়া কতদূর যথাযোগ্য হইয়াছে তদ্বিষয়ে মতামত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত মনে রাখিলে বিরুদ্ধ মতের অনেকটা খণ্ডন হইবে। তাঁহার শেষ সঙ্গীতটি অতি মনোহর হইয়াছে। যদিও তাহার ভিতর বাসনার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং সেটা যোগিনীর স্বভাবোচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি কি অবস্থায় যোগিনীব্রতে দীক্ষিত হন তাহা স্মরণ রাখিলে এ দোষের অনেক লাঘব দেখা যাইবে। এ আভাসটুকু না থাকিলে তাঁহাকে দেবী বলিতাম, থাকা সত্ত্বেও নিষ্কলঙ্ক হতভাগিনী মানবী বলিয়া অশ্রুমতীর জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকা যায় না।"

'স্বপ্নময়ী'। পুরুবিক্রম নাটকের দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকের ধারা প্রবর্ত্তিত করেন, সেই ধারার পুষ্টিসাধনার্থ 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'র পর তিনি 'স্বপ্নময়ী' নামক আর একখানি নাটক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন।

আমরা প্রথম তিনখানি নাটকের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকের আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই নাটকখানি তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শোভা সিংহের বিদ্রোহ অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজদুহিতার অবমাননা করিবার চেষ্টা করিলে রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করেন। স্বদেশপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবি-জনোচিত স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক দেশবাসীর দৃষ্টির সমক্ষে বিদ্রোহী শোভাসিংহকে উন্নতচরিত্র স্বদেশপ্রেমিকরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি মুসলমানগণের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিতে অভিলাষী। অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই গ্রন্থেও অনেকগুলি সুন্দর প্রেমগীতি ও জাতীয় সঙ্গীত আছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি গানও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল গান বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে চিরদিন অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

শোভাসিংহের নিকট দেশপ্রেমে দীক্ষিতা বর্দ্ধমান-রাজদুহিতা স্বপ্নময়ী যথার্থ মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছেন :—

"কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে ?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?
ধন-ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী ?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান ?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ ?
কে তিনি আমার মাতা ?—তিনি জন্মভূমি।
হাঁ সেই জননী মম মোর জন্মভূমি।
সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের।
দ্যাখো দ্যাখো আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।"

জ্যোতিবিন্দ্রনাথ যখন এই সকল নাটক লিখিতেছিলেন, তখন 'ভারতসঙ্গীত' ও 'ভারতভিক্ষা'র কবি হেমচন্দ্রের যুগ। সুতরাং কোনও কোনও স্থানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমান বাদসাহের জন্মদিনের উৎসবে সমস্ত

দেশবাসী মাতিয়াছে ; স্বদেশপ্রাণ শোভাসিংহের মনে এই ঘটনা কিরূপ চিন্তার উদ্রেক করিতেছে ?—

"দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর,
অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে।
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার,
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে,
সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
ভারত কাঁপিছে হরষ রবে !
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস,
মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায়
হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি,
ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি অমর,
অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে,
যুধিষ্ঠির রাজা ভারত-শাসনে,

তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে,

আর্য্য কবি গায় মন-প্রাণ খুলে,

তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি—

ভারতে আজি কি সুখের দিন ?

তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়,

ভারত গাইছে মোগলের জয়,

বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—

কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—

সেথা হতে আসি ভারত-আসন

লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,

তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি,

ভারতে আজি কি সুখের দিন ?

তবে এই সব দাসের দাসেরা,

কিসের হরষে গাইছে গান ?

পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে

কিসের তরে গো উঠায় তান ?

কিসের তরে গো ভারতের আজি,

সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?

যতদিন বিষ করিয়াছে পান,

কিছুতে জাগেনি এ মহা শ্মশান,

বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে,
সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা !
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি, স্বর্গ-রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি,
তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খল করিতে পূজা !
মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া,
মোগল-চরণে লুটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ
ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ,
আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !

হা রে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,

কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার

পরিবারে আজি করি অলঙ্কার

গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?

তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি

মোগলরাজের বিজয়-রবে ?

মোগলবিজয় করিয়া ঘোষণা

যে গায় সে গাক—আমরা গাবনা

আমরা গাব না হরষ-গান,

এস গো আমরা যে কজন আছি

আমরা ধরিব আরেক তান।"

আর এক স্থানে শোভাসিংহ অনুচরগণকে দেশজননীর কিরীট-শোভার জন্য স্বাধীনতারত্ন অর্জ্জন করিয়া আনিতে উদ্দীপ্ত করিতেছেন—

"দূর আকাশের তলে ওই যে রতন জ্বলে

আনিতে কে যাবি তোরা

এই বেলা আয় রে—

মায়ের আঁধার ভালে পরাবি ও রত্নখানি

কে আসিবি আয় তোরা

মিছা দিন যায় রে।

সম্মুখে দুর্গম পথ প্রত্যেক কণ্টক তার
মাড়াইতে হবে বটে
রক্তময় চরণে,
কিন্তু রে কিসের ভয়, আসুক সহস্র বাধা
মাতৃমুখ উজ্জ্বলিবি
কি ভয় রে মরণে।"

আমরা বাহুল্য ভয়ে সুমধুর প্রেম-গীতিগুলির একটিও উদ্ধৃত করিলাম না।

এই সুরুচিসঙ্গত উচ্চভাবপূর্ণ নাটকাবলী প্রণয়ন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাৎকালিক নাট্যকারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'স্বপ্নময়ী'র পরে তাঁহার প্রতিভাশালিনী লেখনী আর এইরূপ নাটক রচনায় নিয়োজিত হয় নাই। এই সময়ে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক লইয়া কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা সন্দর্শন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক-রচনা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দিকে তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা বিনিযুক্ত করিলেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, তিনি একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার

নাটকাবলী সমগ্র দেশবাসী কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত ও সমাদৃত, তিনি কেন নাটকরচনা সহসা পরিত্যাগ করিলেন। উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন—'নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই'। অমৃতলাল বলেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবনে কাহারও নিকটে 'প্রয়োজন নাই' এইরূপ উত্তর শুনেন নাই। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনও যশোলাভকেই সাহিত্য-সাধনার মুখ্য ফল বলিয়া বিবেচনা করেন নাই, সাহিত্য-সেবা তাঁহার নিকট অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। সুতরাং অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অধিকৃত গৌরবময় সিংহাসন প্রতি-দ্বন্দ্বী নাট্যকারকে স্বেচ্ছায় প্রদান করা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আজীবন নীরবে সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন; তিনি ঢক্কানিনাদে কখনও আত্মঘোষণা করেন নাই বলিয়া আজিকার যুগে হয়ত তিনি তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মানও পান নাই; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সাহিত্যসাধনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কি অপূর্ব্ব প্রতিভা তিনি সর্ব্বদা লোকলোচনের অন্তরালে গোপন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সারস্বত সমাজ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ তদীয় আবাসভবনে একটি সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করেন। রবীন্দ্রনাথ এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটী পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সঙ্কল্পিত সভার প্রায় কোনও অনৈক্য ছিল না।"

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন" শীর্ষক এক সন্দর্ভে ঐরূপ সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বিশদভাবে বিবৃত করেন। সন্দর্ভটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধমধ্যে সঙ্কল্পিত সভার অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলী হইতেও অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারেন।

শীঘ্রই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবাসভবনে 'সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হইল। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবকগণ সকলেই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহা উৎসাহের সহিত এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায়ের সহিত ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সভায় যোগদান করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"যখন বিদ্যাসাগরমহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন—আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মত লোককে পরিত্যাগ কর—হোমরা-চোমরাদের লইয়া কোন কাজ হইবে না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না।—এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।"

এই সভায় কিরূপ কার্য্য হইত, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এস্থানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্র-কারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্ব্বত্র এক শব্দ পায় না।

ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে—এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরু-মধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সঙ্কট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহাব করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, channel, mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

Peninsulaকে বাঙ্গালায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত

সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখনও এটা হয় কখনও ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তি সুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা—বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না—কিন্তু একটা পর্ব্বতের নামের বেলায়

অনেকে হয়ত ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি—তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়—কিন্তু আমেরিকায় White mountain নামে এক পর্ব্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটী নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যাভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্য্যরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত, কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন, অল্প বয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়—অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন—সারস্বত সমাজের তিন চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ

ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় পরে পরে উত্থাপিত ও গ্রাহ্য হইল :—

প্রথম—ভূগোলের পরিভাষা স্থির করা আবশ্যক। দ্বিতীয়—তদ্বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধানার্থ একটি সমিতি বসিবে ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমিতির সভ্য হইবেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তৃতীয়—তিনমাস পরে উক্ত সমিতির কার্য্য সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

চতুর্থ—যে সকল ভৌগোলিক শব্দ আলোচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতিতে সমর্পণ করিবেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সারস্বত সমাজের প্রস্তাবসমূহ সুধীগণ কিরূপ সযত্ন সতর্কতার সহিত আলোচনা করিতেন তাহার পরিচয়

স্বরূপ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের একখানি মাত্র পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১)

"দেওঘর, ৪ আষাঢ়

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না। ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণ তন্ত্রের লোক; কেহ কাহার কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। "Irritabile vates trition." আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকি-

তেছে অর্থাৎ দুই তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয় তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্য প্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এবিষয়ে আমাদিগের হাত পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি! কিন্তু কি করা যাইবে? English channel একটি উপসাগরের নাম; channel শব্দে কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরি-

বর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশম্বদ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের কথার উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতির শব্দও ভুক্ত থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।"

সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় দূরদর্শী বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' শীর্ষক সন্দর্ভের শেষভাগে লিখিয়াছিলেন—

"সভার স্থায়িত্বের প্রতি এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে। আমাদের সাহিত্য-সংসারে অনেকগুলি দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই একস্থানে সমবেত হইয়াছেন, এখানে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলির ভাব

ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত একহৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারস্বত সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল। নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে,—সে কেবল বাঙ্গালীর আর একটি কলঙ্ক-ধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত।"

দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে যে, অনতি-দীর্ঘকালের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদুদ্দেশ্য বিফল করিয়া তাঁহার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

'বিদ্বজ্জন সমাগম।' এই সময়ে জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ তদীয় ভবনে একটি বার্ষিক সাহিত্যসম্মেলনেরও অনুষ্ঠান করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই সম্মেলনের নামকরণ করিয়াছিলেন 'বিদ্বজ্জন-সমাগম'। এই সম্মেলনে প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণকে নিমন্ত্রিত করা হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে নানাপ্রকার গীতবাদ্যের এবং অভিনয়ের আয়োজন করিতেন। এই সকল অভিনয়ে পরিবারস্থ বালকবালিকাগণই যোগদান করিতেন।

"কালমৃগয়া" ও "বাল্মীকি-প্রতিভা" এই উপলক্ষেই প্রথম রচিত ও অভিনীত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের

ভবনে 'কালমৃগয়া'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের, রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ও কন্যা অভিজ্ঞা দেবী যথাক্রমে অন্ধমুনির পুত্রকন্যার এবং পরিবারস্থ বালিকাগণ বনদেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'ভারতবন্ধু' নামক তৎকালীন এক সংবাদপত্র হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"বিদ্বজ্জন-সমাগম। গত শনিবার রাত্রে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়াছিল। এই সমাগম উপলক্ষে "কালমৃগয়া" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাট্যগীতি রচিত হইয়া ঐ রাত্রে অভিনীত হয়। অভিনয় অনেকাংশে সুন্দর্] হইয়াছিল। গৃহদেবীরা বন দবী সাজিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। চবকের অভিনয়ের শেষাংশ ভাল হয় নাই। মুনিকুমার পিতার নিমিত্ত জল আনিতে গেলে লীলা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধমুনির নিকট যেরূপে গান গাহিয়াছিল, তাহা শুনিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।"

'বাল্মীকি-প্রতিভা' আরও সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, তিনি কনসার্টের ভার লইয়া-

ছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অধিকাংশ গীতই জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত হইয়া-ছিল। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা (পরে স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের সহ-ধর্ম্মিণী) প্রতিভা দেবী সরস্বতীর, এবং সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা (এক্ষণে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী) ইন্দিরা দেবী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অভিনয় অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

একবার প্রতিভা দেবী সহসা অসুস্থ হওয়ায় অভি-নয়ে যোগদান করিতে অসমর্থ হন। সেবার ভয়ানক ঝটিকার (cyclone) জন্য অভিনয়ের আয়োজনও পণ্ড হইয়া যায়। "বিদ্বজ্জনসমাগম"ও সেই অবধি বন্ধ হইয়া যায়।

'হঠাৎ নবাব'—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করিলে যোড়াসাঁকোর বাটীতে নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ-উৎসবের অনুষ্ঠান হইত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সকল উৎসবের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। 'অলীক বাবু'র ন্যায় 'হঠাৎ নবাব'ও গার্হস্থ্য অভিনয়ের উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বির-

চিত হইয়াছিল। এই প্রহসনখানি ১৮০৬ শকের বৈশাখ অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহা মৌলিক কল্পনা-প্রসূত নহে, জগৎপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রহসনকার মলিয়র-প্রণীত "লে বুর্জোয়া জঁতিয়ম্" নামক প্রহসন হইতে উহা অনূদিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী সাহিত্যকুঞ্জের বহু অপূর্ব্ব প্রসূন বঙ্গবাণীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার দিগন্তবিসর্পী সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জ চিরদিন সুরভিত থাকিবে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সকল অনুবাদ গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দিবার স্থান নাই, যদিও সাহিত্যের এই চির অবজ্ঞাতক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার যে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও শক্তি বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে একটি বিশিষ্ট এবং উচ্চস্থান প্রদান করিবে।

এই প্রহসনের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই। কোনও দোকানী হঠাৎ কিছু ধনলাভ করিয়া বড়লোকের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। তাহার দুহিতা এক দরিদ্র যুবাকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া সে কিছুতেই সেই যুবার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইল না। তখন ঐ যুবা কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তুর্কের নবাব সাজিয়া ছদ্মবেশে তাহাকে প্রতারিত করিল। বলা বাহুল্য এই

গ্রন্থখানিতে প্রচুর হাস্য রস আছে এবং ইহা পরবর্ত্তী বহু প্রহসনের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল।

ব্যবসায়বাণিজ্য ও ষ্টীমার পরিচালনা।

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁহার ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী কংগ্রেসের বিখ্যাত কর্ম্মী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহযোগে পাটের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। পরে উহা বন্ধ করিয়া তিনি শিলাইদহে কিছুদিন নীলের চাষ করেন। ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই নীলের বাজার খারাপ হওয়াতে তিনি এই ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন।

এই সময়ে একদিন 'এক্সচেঞ্জ গেজেটে' এক বিজ্ঞাপন দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নে নীলামে গেলেন এবং বাটি ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, সাত হাজার টাকা দিয়া তিনি একটি জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। ইহার উপর এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা প্রস্তুত করিয়া একটা সম্পূর্ণ জাহাজ প্রস্তুত করিতে হইবে। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি অগ্রণী হইয়া প্রথম ষ্টীমার পরিচালনা করি-বেন এই আকাঙ্ক্ষায় তিনি মাতিয়া উঠিলেন; এবং সুদক্ষ য়ুরোপীয় এঞ্জিনিয়ারদিগের তত্ত্বাবধানে জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথের—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলি কেন বাঙ্গালীর—প্রথম ষ্টীমার "সরোজিনী" কিছু দিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল; এবং সুনিপুণ ফরাসী পোতাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিপুল অর্থব্যয়ে "বঙ্গলক্ষ্মী", "স্বদেশী", "ভারত" এবং "লর্ড রিপণ" নামে আরও কয়েকখানি ষ্টীমার ক্রয় করেন। এই সকল জাহাজ খুলনা এবং বরিশালের মধ্যে যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত এবং সময়ে সময়ে কলিকাতা-তেও বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া আনিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ষ্টীমার পরিচালনা কার্য্য আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'ফ্লোটিলা কোম্পানী' নামক এক য়ুরোপীয় কোম্পানী ষ্টীমার পরিচালনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। উভয় দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল।

বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ তখন জাগরিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্র স্বদেশানুরাগী সজ্জনগণ স্বদেশী জাহাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা দেশবাসীকে বিদেশী জাহাজে আরোহণ করিতে নিষেধ করা হইতে লাগিল। এই সকল স্বদেশহিতৈষীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর পিতা লাকুরিয়ার জমীদার ৺রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর নাম

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "বালকে" প্রকাশিত এবং 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে পুনর্মুদ্রিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বরিশালের পত্র' হইতে কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য :—

"তুমি অবশ্য জান এখানে আমার যেমন জাহাজ চলবে তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানীরও জাহাজ চলবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলা কোম্পানীর অনেক খরচপত্র লোকজনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে তবু তারা সমান নিয়মিত ভাবে জাহাজ চালাচ্চে—যত্নের একটু ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করে না ; আর তারা প্রকাশ্য ভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, তারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে ? এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের, বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখন দেখিনি, তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায় ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে

যায়, এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে' দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমন কি, পায়ে পর্য্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন—যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠছে সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন—'আমাদের কথাটি একবার শুনুন,-তারপর যে জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাকতে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হত, অপমান করা হত,—আমাদের নিমন্ত্রণেই আমাদের আহ্বানেই ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন, তখন কি আপনার ও-জাহাজে যাওয়া উচিত? 'তা বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক্।' এই বলে যাত্রীরা আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার বৎসর বয়স্ক বালক ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়াছিল। 'হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইবা না।

উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ, উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশী বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ, উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই—ওপারে লইয়া গিয়াছে এবং এই বাতাসেই দোদুল্যমান হইতেছে, যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত ভাই সকল, ঐ জাহাজে যাইবা না—" এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হল আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক বৃষ্টি হোক রৌদ্র হোক—যে কোন বাধা হোক, কিছুই না মেনে তাঁরা জাহাজের সিটি (বাঁশির ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাঁহারা বলেন আমাদের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুনতে পেলে তাঁহাদের এমন আমোদ হয় যে তাহা বলবার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুনলে যেমন বুঝা যায় কে আসছে তেমনি সিটি শুনলেই কোন্ জাহাজ আসছে তাঁ'রা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আসছে, ঐ "লর্ড রিপণ" আসছে, ঐ "বঙ্গলক্ষ্মী" আসছে, ঐ "স্বদেশী" আসছে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বলছিলেন, যেমন বৃন্দাবনের

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁহাদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়। আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটিও তাঁদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোনদিন যাত্রী পায়—সেদিন তাঁদের আপসোসের আর সীমা থাকে না।

সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এখানে যে বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টীমারের উল্লেখ করতে করতে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—তাঁর ষ্টীমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা তো আমাদেরই ষ্টীমার—এই কথাটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন, একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এখানকার হাকিম, উকীল, জমিদার, দোকানদার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সে দিন ছাত্রদিগের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়ে ঘরটি

সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়—নিরুদ্যম হৃদয়ে উদ্যমের ভাব আসে।"

বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় পক্ষই আর্থিক ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিপক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ফ্লোটিলা কোম্পানী টিকিটের মূল্য হ্রাস করিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তদপেক্ষা মূল্য হ্রাস করিলেন। এইরূপ করিতে করিতে একরূপ বিনামূল্যেই যাত্রীগণকে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিপক্ষকে উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইলেন। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে যাত্রীগণের নিকট টিকিটের মূল্য লওয়া দূরে থাকুক, বিনামূল্যে তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া স্বদেশী জাহাজে লওয়া হইত। স্বদেশী ষ্টীমার পরিচালনায় এই প্রথম উদ্যম সফল করিবার জন্য, দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, স্বদেশপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব ধরিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি পড়িতে লাগিল এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত

হইয়া গেল, বরিশাল খুলনার ষ্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা-মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলান্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রীসংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না। সুতরাং তিন ত্রিকূণে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মত লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকু মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার

কর্ম্মচারীরা যে তপস্বীর মত উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই ; অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্ম্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই ; কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার— সে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার।"

প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও কিছুদিন দেশের জন্য ষ্টীমার পরিচালনা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, প্রতিপক্ষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আর একটি য়ুরোপীয় কোম্পানীকে (হোরমিলার কোং) সমুদয় স্বত্ব বিক্রয় করেন। একটি য়ুরোপীয় কোম্পানীকে ফেল করিয়া অপর একটি কোম্পানীকে ফেল করিবার শক্তি না থাকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। তাঁহার "স্বদেশী" নামক জাহাজ খুলনা হইতে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত পথ আসিয়া হাওড়ার পুলে ঠেকিয়া হঠাৎ জলমগ্ন হইল। জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্যাদিও সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। কেহ কেহ বলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোনও কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ষ্টীমার পরিচালনা কার্য্য বন্ধ করিতে

বাধ্য হইলেন। বাবু (পরে রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে একটি প্রস্তাব আনিলেন যে তাঁহারা উপযুক্ত মূল্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত কারবার ক্রয় করিতে প্রস্তুত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পাইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার প্রভূত ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময়ে দানবীর পরোপকারী স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহার বন্ধুর উপকারার্থে অগ্রসর হইলেন। তিনি উত্তমর্ণদিগকে বুঝাইয়া এবং স্বয়ং প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই জন্য তারকনাথের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন।

এইরূপে, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাত হাজার টাকায় ক্রীত জাহাজের খোল ভর্ত্তি হইয়াছিল "কেবল এঞ্জিন ও কামরায়-নহে, ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। • কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে এই সকল চেষ্টায় ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ

বেহিসাবী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন ; সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"

আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু একদিন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, "প্রবাল-কঙ্কাল হইতেই মহাদ্বীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" আমরা বিশ্বাস করি, স্বদেশপ্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে সফল হইয়া স্বদেশের গৌরব বিঘোষিত করিবে।

"বালক"। যে সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ষ্টীমার পরিচালন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি সে সময়ে সাহিত্য ও শিল্পচর্চ্চায় অনবহিত ছিলেন না। ঠিক এই সময়েই (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে সম্পাদিকা করিয়া রবীন্দ্রনাথ কিশোরবয়স্কগণের জন্য "বালক"

নামক একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১১ই মাঘ মাঘোৎসব হইয়া যাইবার পর তিনি ও পরিবারস্থ অপর কয়েকজন বালক পরদিন ভাঙ্গা আসরে "১২ই মাঘ" করিতেন। বালকবালিকারা মিলিয়া নানাপ্রকার আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ করিতেন। এইরূপ এক ১২ই মাঘের সম্মিলনীতে ৺হিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহারা কয়েকজন স্থির করেন একটা বালক-বালিকা পরিচালিত মাসিকপত্র বাহির করিতে হইবে। বোধ হয় এই প্রস্তাব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে 'বালক' প্রকাশের ইচ্ছা উদিত হইয়া থাকিবে। বালকে, পরিবারস্থ অন্যান্য লেখক-লেখিকাগণের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে "মুখচেনা" নামক প্রবন্ধটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। উহাতে বাঙ্গালার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতিসহ শিরসামুদ্রিকানুসারে তাঁহা-দের চরিত্রসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্নীবিয়োগ। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত

হন। তিনি রমণীয় গুণগ্রামের অধিকারিণী ছিলেন এবং যদিও পরিবারস্থা অন্যান্য মহিলাগণের ন্যায় তিনি স্বয়ং সাহিত্যসেবা দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই, মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট শ্রুত হইয়াছি যে, তিনি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাহিত্যালোচনায় আনন্দ অনুভব করিতেন। স্বর্ণকুমারী বলেন, তিনি প্রায় তাঁহার সমবয়স্কা ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সাহিত্যানুরাগ এই প্রীতির সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় পরিবারস্থ সকলেই নিরতিশয় ব্যথিত হন। প্রিয়তমা পত্নীর অকালবিয়োগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। (এই সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ "ভারতী"র সম্পাদন-ভার স্বর্ণকুমারীর হস্তে অর্পণ করেন)।

কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে এই গভীর দুঃখ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার একজন বন্ধু বলেন যে, এরূপ অবস্থায় সচরাচর লোকে হয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চিরজীবন বিষণ্ণভাবে অতিবাহিত করে, নতুবা চরিত্রভ্রষ্ট হয়। নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম তখন ৩১ বৎসর মাত্র।

তাহার পর তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিনও ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া বিষাদে আচ্ছন্ন হন নাই। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার সাধনায় তিনি একনিষ্ঠ সাধকগণের ন্যায় নিমগ্ন থাকিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং সকলকে উপভোগ করাইতেন। বার্দ্ধক্যেও তিনি শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন এবং আনন্দের সহিত বালক-বালিকাগণের শিশুসুলভ ক্রীড়া ও গানে যোগদান করিতেন। তাঁহার আনন্দপূর্ণ আনন দেখিলে মনে হইত তিনিই যথার্থ আনন্দময়ের উপাসক।

সাধনা। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত মাসিক পত্র "সাধনার" প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসর এই মাসিক পত্র বঙ্গবাসীকে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করিয়াছে তাহা বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অন্যান্য প্রতিভাশালী লেখকগণের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই মাসিকপত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "আধুনিক মস্তিকতত্ত্ব

ও ফ্রেনলজি", "লোকচেনা" প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ আলোচনা করেন নাই।

চিত্রাঙ্কন। এই সময় হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রীতিমত পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তির মুখের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার খাতায় অসংখ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। রাজা মহারাজা হইতে পাখা টানা কুলীও তাঁহার খাতায় সসম্মানে স্থান পাইয়াছে। এই চিত্রগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম রদেনষ্টাইন কোনও সাময়িক পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি দেখিয়া মোহিত হন এবং (তৎকালে ইংলণ্ড প্রবাসী) রবীন্দ্রনাথকে কয়েকখানি মূলচিত্র আনাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ অনুসারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকখানি ছবির খাতা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। এই খাতাগুলি রদেনষ্টাইনকে দেখাইবার পর রবীন্দ্রনাথ ও রদেনষ্টাইন জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন-শক্তি সম্বন্ধে রদেনষ্টাইনের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন:—

ভাই জ্যোতি দাদা

আপনার ছবির খাতা আমি Rothenstein কে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist ; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। Most marvellous, most magnificent—এইত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art critic কে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত।…যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোটেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একে-

বারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথা চাপা রাখলে চল্‌বে না।

২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি।

রদেনষ্টাইন লিখিয়াছিলেন :—

11 Oak Hill Park, Frognal
Hampstead
Sept. 14,' 12.

My dear sir,

Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings

of the men or of the women, Your drawing of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossette and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been—and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. One or two of your sitters, it has been my privilege to meet—I need not speak of your brother Rabindranath, so dear to all of us here; there a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I saw at Benares. I hope, with your permission, to get one or two of your drawings reproduced here. If ever I return to India—a hope which is very near my heart—the privilege of your acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

Your brother's presence among us is a

great joy to us and his friendship I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you for your prompt response to my wish to see more of your work.

Believe me to be most faithfully yours

William Rothenstein.

রদেনষ্টাইনের অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার কতকগুলি চিত্র ইংলণ্ডে মুদ্রিত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই চিত্রপুস্তকের ভূমিকায় রদেনষ্টাইন যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনও বন্ধু কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে কতকগুলি চিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি দেখিয়াছিলাম—সে চিত্রগুলিতে একটি বিশিষ্টতা ছিল। গত বৎসর যখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি জানিতে পারি যে, চিত্রগুলি তাঁহারই এক সহোদরের অঙ্কিত। তিনি কতক গুলি মূল চিত্রের জন্য তৎক্ষণাৎ পত্র লিখেন এবং আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহার কয়েকখানি ছবির খাতা প্রাপ্ত হই। চিত্রাঙ্কন

ঠাকুর মহাশয়ের ব্যবসায় নহে। নিজের অনুরাগ বশতঃ ও আনন্দলাভার্থ তিনি বহুদিন হইতে আত্মীয় ও বন্ধু-গণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন, এবং সখের চিত্রকরগণের নিকট আমরা যে একাগ্রতা ও যথার্থতা আশা করিয়া থাকি অথচ প্রায়ই দেখিতে পাই না, সেই গুণগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কিত মুখগুলিতে এমন একটি আকৃতির সচেতনভাব আছে যাহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার আরও বোধ হয় চিত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। উহাতে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ বা মোগল আদর্শের অনুসরণের জ্ঞানকৃত চেষ্টা নাই। ভারতীয় মহিলাগণের চিত্রগুলি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় চিত্রকরগণ নারীসৌন্দর্য্যের এরূপ ম্লান ও চেতনাহীন কল্পনার প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে, আলোচ্য চিত্রগুলির ন্যায় স্বাভাবিক ও প্রাণময় চিত্রের জন্য ডুরার ও হলবীনের যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়। চিত্র-গুলিতে জীবনের পরিদৃশ্যমান অপূর্ব্ব বিচিত্রতা ও মনো-হারিতা লক্ষ্য করিয়া আমি একটি কথা বুঝিতে পারি না যে, কেন ভারতবর্ষের নবীন যুগের চিত্রকরগণ মোগল ও

রাজপুত আদর্শ হইতে বিষয় এবং অঙ্কনপদ্ধতি গ্রহণ করিতেছেন।

"আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাসে ইহা একটি ক্ষণস্থায়ী রূপভেদ বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চয়ই য়ুরোপীয় অপকৃষ্ট শিল্পের অনুকরণ এবং তুচ্ছ ও নীরস বিষয়ের অনুসরণের প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করিবার প্রশংসনীয় অভিপ্রায়ই ইহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিল্পে উচ্চশ্রেণীর চিত্রাঙ্কন এবং মহতী কল্পনারও অভাব নাই এবং ইহাদের প্রভাবও বোধ হয় অপকারী নহে, যদিও সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ চিত্রের নিদর্শন অল্পই আমদানী হইয়াছে। কোন বিজাতীয় পদ্ধতির জ্ঞানকৃত অনুকরণে কোনও সজীব চিত্রকরসম্প্রদায় গঠন করা অসম্ভব বটে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পুরাতন পদ্ধতির অনুকরণের দ্বারাও এরূপ সম্প্রদায়কে জীবনদান করা যায় না। অনুকরণ দ্বারা নূতন শিল্পপদ্ধতির সৃষ্টি হয় না,—উহার উৎপত্তি চিত্তের আবেগময়ী কল্পনায়। ভাবের চাষ হইতেই শিল্পের উৎপত্তি, এবং সাধারণ কৃষিকর্ম্মের ন্যায় ইহাতেও অসীম পরিশ্রম, নিপুণতা, ধৈর্য্য এবং অদম্য অধ্যবসায়ের আবশ্যক এবং ইহা ব্যতীত সরস ও স্বাস্থ্যকর ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথ ঠাকুরের চিত্রসমূহে আমি এই আবেগময়ী কল্পনার আভাস দেখিতে পাই। ইহা অতি সরল ও আড়ম্বর-বিহীন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহার চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার মুখাকৃতির কমনীয়তা ও চরিত্রের গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছায় তিনি প্রণোদিত ছিলেন।

"আমরা সচরাচর রাজা মহারাজাদিগের রাজবেশ-পরিহিত চিত্র কিম্বা ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিষয়ক পুস্তকে অদ্ভুত রকমের আলোকচিত্র দেখিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছি যে, এই সকল সুশিক্ষিত ভারতীয় মহিলা ও ভদ্রব্যক্তিগণের (যাঁহাদের বিষয় আমরা ইংলণ্ডে অল্পই শুনিতে পাই বা জানিতে পারি) চিত্রদর্শন অত্যন্ত অভিনব ও আনন্দ-জনক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অঙ্কিত ২৫ খানি চিত্রের প্রতিলিপি মিঃ এমেরি ওয়াকার দ্বারা প্রস্তুত করাইবার অনুমতি দিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া আমরা বাঙ্গালী জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই, এই সকল চিত্র হইতেও আমরা অনেকেই সেইরূপ পরিচয় পাইতে পারি।

"আমি আধুনিক প্রতিকৃতি অতি অল্পই দেখিয়াছি

যাহাতে এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।"

এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। আশা করি উহা হইতে পাঠকগণ উইলিয়াম রদেনষ্টাইনের উক্তির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

'হিতে বিপরীত।'—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুকাল নাটক-প্রহসনাদি রচনা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। একদিন মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী তাঁহাকে বলেন, "তুমি অনেকদিন নাটক রচনা কর নাই—একখানি নাটক লেখ।" জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রথমে সম্মত হন নাই, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং যতক্ষণ নাটক লেখা শেষ না হয় ততক্ষণ মুক্তি প্রদান করিবেন না এইরূপ অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে দায়ে পড়িয়া জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ তাঁহার ক্ষুদ্র নাটিকা 'হিতে বিপরীত' লিখিতে বাধ্য হন। এই নাটিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ ১৪ই বৈশাখ) প্রকাশিত হয় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সহিত

ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর শুভ বিবাহোপলক্ষে নাতিনীকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। উৎসর্গ-পত্রটী এইরূপ :—

নাতিনীর শুভ বিবাহে উপহার

নলিনি, জুটিল তোর সুহৃদ্ ভ্রমর,
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বর।
কি দিয়া তুষিব তোরে কি আছে রতন,
সম্বলের মধ্যে মোর একটু যতন।
যতনে গাঁথিনু তাই বাক্যময় হার,
কৌতুক-যৌতুক এই লহ উপহার।

এই নাটিকাখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে ও সঙ্গীত-সমাজে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

'স্বরলিপি' 'গীতিমালা' ও 'বীণাবাদিনী।'—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিকপত্রে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন' নামক বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতাদিগের সাহায্যে 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' নামক এক স্বরলিপি-সম্বলিত ১৬৮টী বাঙ্গলা গানের সংগ্রহ প্রকাশ

করেন। উক্ত গ্রন্থে 'সংখ্যামাত্রিক' স্বরলিপির পরিবর্ত্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি ব্যবহৃত হয়। উক্ত ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম জ্যোতিবাবুর সহিত পরিচিত হই। আমি তখন সবে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আমার পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন' নামে বিখ্যাত ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি। তখন আমাদের দোকান ২৬৭ বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। জ্যোতিবাবু প্রায় প্রত্যহ আমার পিতা বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন—কারণ তখন "স্বরলিপি-গীতি-মালা" যন্ত্রস্থ। পিতৃদেব উক্ত পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং জ্যোতিবাবু স্বাভাবিক মহত্ত্বসহকারে উহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। "সাধনা" মাসিকপত্রে জ্যোতিবাবু যে 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি'র প্রবর্ত্তন করেন, সেই পদ্ধতি গ্রন্থে অবলম্বিত হয়। 'স্বরলিপি-গীতিমালা' দ্বারা আকারমাত্রিক স্বরলিপির বহুল প্রচার হয়। এই নূতন স্বরলিপি-পদ্ধতি

সঙ্গীত ও বাদ্যশিক্ষা সরল ও সহজ করিয়াছে। ইহার আর একটি গুণ এই যে, সচরাচর মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল অক্ষর বা চিহ্ন থাকে তাহা দ্বারাই স্বরলিপি মুদ্রিত করা যাইতে পারে। গানের স্বরলিপি রীতিমত প্রকাশ করা আজি কালি প্রায় সকল বাঙ্গলা মাসিক পত্রেরই অঙ্গ হইয়াছে। জ্যোতিবাবু এই স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত না করিলে ইহা সম্ভব হইত না।"

'স্বরলিপি-গীতি-মালা' ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে (১৩০৪ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। এদেশে সঙ্গীতবিদ্যা বিস্তারের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতদূর আগ্রহশীল ছিলেন তাহার পরিচয় প্রদানার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থে শিক্ষার্থীর প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন হইতে দুইটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যদি কোন শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোন অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোন গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।"

স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্'এর সাহায্যে সঙ্গীত ও স্বরলিপি-প্রকাশিনী একটি মাসিক পত্রিকা— 'বীণাবাদিনী' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রকাশের অল্পদিন পরেই জ্যোতিবাবু ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার বিস্তার কল্পে বাঙ্গালা ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার কল্পনা করিলেন। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন এবং উহা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ক্ষতি স্বীকার করিতেও সম্মত হইলেন। ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'বীণাবাদিনী' নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সঙ্গীতসম্বন্ধীয় মৌলিক প্রবন্ধ ব্যতীত 'বীণাবাদিনী'তে বহু নূতন ও পুরাতন সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তনের দুই বৎসর পরে রহিত হয়; কারণ তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-সমাজের মুখপত্র স্বরূপ 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

"জ্যোতিবাবু 'বীণাবাদিনী'র প্রতিষ্ঠার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বহু স্বরলিপি ও মন্তব্যাদি লিখিতেন, অন্যান্য লেখক-লেখিকাদিগের নিকট হইতে রচনা সংগ্রহ করিতেন, স্বয়ং প্রুফ দেখিতেন, গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন, বন্ধুদিগের নিকট হইতে পত্রিকার মূল্য আদায় করিয়া দিতেন। তখন তিনি বালীগঞ্জে থাকিতেন, কিন্তু প্রত্যহ 'বীণাবাদিনী' যেখানে মুদ্রিত হইত সেই ভারতমিহির প্রেসে স্বয়ং গিয়া কম্পোজিটর-দিগকে উপদেশ দিতেন বা প্রুফ সংশোধন করিয়া দিতেন।

"জ্যোতিবাবু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সেতার ও এস্রাজ বড় ভালবাসিতেন। তিনি আমাদিগকে এই যন্ত্রদ্বয় নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের জন্য প্রায়ই অনুরোধ করিতেন এবং যখন আমরা এই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করি তখন তিনি পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ'। পুণায় অবস্থান-কালে তত্রত্য 'গায়ন সমাজ' দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় 'সঙ্গীত-সমাজ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহু সঙ্গীতানুরাগী ভদ্রমহোদয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সাধু

সংকল্পে যোগদান করেন এবং মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে "ভারতসঙ্গীত-সমাজ" সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এই সমাজপ্রতি- ষ্ঠার সংকল্প জ্ঞাত করাইলে তিনি এক সহস্র টাকা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করেন। ঠাকুরপরিবার হইতে আরও সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালার অভিজাতগণ এই সমাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর বলেন, এই সমাজপ্রতিষ্ঠার কল্পনার জন্যই কেবল সঙ্গীতসমাজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট ঋণী নহে, প্রথম অবস্থায় ইহার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক-একদিন রাত্রি ২টা ৩টা পর্য্যন্ত তিনি সমাজগৃহে থাকিয়া অভিনয় ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়াইতে পারিত না। সমাজপ্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই সঙ্গীতসমাজের কয়েকজন সভ্যের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিরোধ ঘটে। এমন কি, ইহা লইয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন সভ্যের সহযোগিতায় 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ' কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটী হইতে

স্থানান্তরিত করেন। বিপক্ষগণ 'সঙ্গীতসমিতি' নাম দিয়া একটী সঙ্গীতসমাজ কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে স্থাপিত করেন। 'সঙ্গীতসমিতি' বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ' এখনও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কীর্ত্তিমন্দির-স্বরূপ বিরাজিত আছে। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথই সঙ্গীতসমাজের প্রথম সম্পাদক। বহুদিন সম্পাদকের কার্য্য করিয়া অবশেষে তিনি উহার অন্যতম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীতসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' 'অলীকবাবু' 'হিতে বিপ-রীত' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বহুবার অভিনীত হইয়া-ছিল। এইখানে অভিনয়ের জন্য তিনি কয়েকখানি গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন, যথা—পুনর্বসন্ত, বসন্ত-লীলা, ধ্যানভঙ্গ। ইহার মধ্যে পুনর্বসন্তগীতিনাট্যখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পূর্ব্বে একদা ষ্টীমারে বেড়াইতে বেড়াইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তদীয় অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কতকগুলি গান রচনা করেন এবং সেইগুলি সংযোজিত করিয়া যোড়া-সাঁকোর বাটীতে অভিনয়ার্থ "মানভঙ্গ" নামক একখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। এই 'মানভঙ্গ'ই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া 'পুনর্বসন্ত' রচিত হয়।

'পুনর্বসন্তে' মহাকবি সেক্সপিয়রের Midsummer Night's Dream এর ছায়া লক্ষিত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র নৃত্যগীত আমোদে নিশিদিন কার্য্যে অবহেলা করায় নারদের রোষভাজন হন এবং কলহ দেবতা সুযোগ পাইয়া উর্ব্বশীর প্রতি ইন্দ্রের আসক্তির কথা শচী দেবীকে বুঝাইয়া ইন্দ্রের সহিত ইন্দ্রাণীর বিবাদ ঘটান। ইন্দ্রাণী দেবরাজের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। সুদিনের সখা মদন ও বসন্তও নন্দন-কানন পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে রতির চেষ্টায় বনদেবতাগণের আহ্বানে মদন ও বসন্ত আবার নন্দনে ফিরিলেন। "থর থর কম্পিত মর্ম্মর মুখরিত, নবপল্লব-পুলকিত ফুলকুল-আকুল মালতী-বল্লীবিতানে সুখছায়ে মধুবায়ে" বসন্তের পুনরাবির্ভাব হইল, তখন তরুলতা কুসুমসুষমাসম্পন্ন হইল তখন,—

"পিক কুল আকুল কুঞ্জে কুঞ্জে—
কুহু কুহু মুহু মুহু কুহরে, পাপিয়া ঝঙ্কারে।"

শচী তখনও মানময়ী, মদন "ভ্রমরের ছিলা কুসুম চাপ" লইয়া 'অব্যর্থ সন্ধান' করিলে শচীর মান অভিমান ভাসিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন,

রমণীর প্রেম,
স্রোতে অভিমান, সখি, বালীর বন্ধন।

এবং পতির মিলনলালসাবতী হইয়া পড়িলেন—অবশেষে সুরদম্পতীর মিলন হইল। সখীগণ ব্যঙ্গভরে শচীকে বলিল,—

সেই তো মল খসাতে হল, দেশ কেন হাসালে ?
প্রাণদায়ে মান ভাসালে।"

এই "অদ্ভুত-রসমিশ্র গীতিনাট্যে" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব নাটকীয় রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ কবির সুললিত সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহার উপাদেয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার গানগুলি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রদত্ত সুরগুলি এত মিষ্ট যে এই গীতিনাট্যখানি সে সময়ে সঙ্গীতানুরাগিগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সঙ্গীতসমাজে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

"সঙ্গীত-প্রকাশিকা"। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে 'বীণাবাদিনী' নাম্নী সঙ্গীতবিষয়িণী মাসিকপত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতসমাজের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগের সময়ে কতিপয় সঙ্গীতানুরাগী বন্ধুর অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "সঙ্গীত-প্রকাশিকা" নাম্নী একটী বৃহদাকারের সঙ্গীতবিষয়িণী মাসিক-পত্রিকা

সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। সন ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরাধিপতি এই মাসিকপত্র প্রকাশের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০৲ টাকা অর্থসাহায্য করিতেন। বহুবৎসর এই মাসিক-পত্রিকাখানি সুযোগ্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। একদিন মাননীয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ করিতে দেন। যে সংস্কৃত নাটকের স্যর উইলিয়ম জোন্স-কৃত ইংরাজী অনুবাদের ফষ্টর-কৃত জার্ম্মাণ অনুবাদ পাঠ করিয়া জার্ম্মাণীর বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ও কবি গ্যেটে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

"চাহ কি দেখিতে তুমি অভিনব বরষের
ফুল, আর পরিণত বরষের ফল,
আর সেই সব যাহে, চিত্ত হয় বিমোহিত,
উল্লসিত, ভোগতৃপ্ত, সম্ভোগ-বিহ্বল ;
দেখিতে চাহগো যদি, একটি নামের মাঝে
স্বর্গ মর্ত্ত সম্মিলিত দোঁহে একাধারে,
শকুন্তলে! তোর নাম করি আমি উচ্চারণ
তা হলেই সব বলা হয় একেবারে।"—

সেই নাটকের মূল পাঠ করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যের পরম অনুরাগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সময় হইতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয় এবং তিনি একে একে প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটকগুলি অধ্যয়ন করেন এবং সাধারণকে তাঁহার আনন্দের অংশী করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় সেগুলির অনুবাদ করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাঁহার অনূদিত গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ মাত্র সম্ভব:—

অনূদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশের তারিখ
অভিজ্ঞানশকুন্তলা	১৩০৬
উত্তর-চরিত	১৩০৭
রত্নাবলী	"
মালতীমাধব	"
মুদ্রারাক্ষস	"
মৃচ্ছকটিক	১৩০৮
মালবিকাগ্নিমিত্র	"
বিক্রমোর্ব্বশী	"
মহাবীরচরিত	"

চণ্ডকৌশিক	,,
বেণীসংহার	,,
প্রবোধচন্দ্রোদয়	,,
নাগানন্দ	১৩০৯
বিদ্ধশালভঞ্জিকা	১৩১০
ধনঞ্জয়বিজয়	,,
প্রিয়দর্শিকা	১৩১১
কর্পূরমঞ্জরী	,,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৮ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখের 'রঙ্গালয়'-পত্রে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ;—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালার একজন কৃতকর্ম্মা লেখক ; বাঙ্গালীর সাহিত্য-পুষ্টির হিসাবেও তিনি কৃতকর্ম্মা, নাট্যকলার গৌরব-সাধন হিসাবেও তিনি কৃতকর্ম্মা। তাঁহার অশ্রুমতী, তাঁহার সরোজিনী নাটক, তাঁহার পুরুবিক্রম, তাঁহার অলীক বাবু বাঙালার কে না জানে; কে না দেখিয়াছে ?

সাহিত্যক্ষেত্রের এ সকল কীর্ত্তি তাঁহার অক্ষয় থাকিবে আমরা জানি; কিন্তু তিনি সম্প্রতি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, যাহার উদ্‌যাপন তিনি শীঘ্র করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ,—অথচ তিনি ব্যতীত এ মহাব্রতের উদ্‌যাপন বাঙ্গালায় আর কেহ করিতে পারে না বলিয়া আমাদের এই বিশ্বাস—সেই কার্য্যই তাঁহার স্মৃতির, তাঁহার যোগ্যতার, তাঁহার মেধার, তাঁহার পাণ্ডিত্যের, তাঁহার কবিত্বের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে। সংস্কৃতভাষা বাঙালা ভাষার মাতৃস্বরূপিণী; সংস্কৃত-নাট্যশাস্ত্র বাঙালার নাট্যরঙ্গের আধার-ভূমি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সকল নাটক-নাটিকা ও সম্পূর্ণ কাব্যের বাঙলায় ভাষান্তরিত করিতে-ছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলা হইতে বেণীসংহার পর্য্যন্ত প্রায় বারখানা সংস্কৃত নাটকের বাঙলা অনুবাদ তিনি করিয়াছেন। অতি বড় বিদ্বেষীও জ্যোতিবাবুর এই কয়খানি অনূদিত গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যোতিবাবু কেবল প্রতিভাবলেই বলীয়ান নহেন, অসাধারণ পরিশ্রমসামর্থ্যেও ঐশ্বর্য্যবান। কেরি-কৃত দান্তের অনুবাদ পড়িয়াছি, জাওয়েটের হোরেস পড়িয়াছি; বৈদেশিক কবির কাব্য-গাথা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া

যে-সকল পণ্ডিত যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের গুণপনার পরিচয় পাইয়াছি; তাই সাহসভরে বলিতে পারি যে আমাদের জ্যোতিবাবু এ কার্য্যে এই সকল পাশ্চাত্য বুধগণের অপেক্ষা গুণপনায় কোন অংশে ন্যূন নহেন। আমাদের একথা অত্যুক্তি নহে, স্তুতি-বচনও নহে, যাঁহারা জ্যোতিবাবুর এই কয়খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন তাঁহারা আমাদের কথা সমর্থন করিবেন।

"অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তরচরিত, মালতী-মাধব, রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, চণ্ডকৌশিক—এই কয়খানি সংস্কৃত নাটক ও নাটিকা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। উহাদের যেমন সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ, সুন্দর বাঁধাই, তেমনি অনুবাদ-ভঙ্গীও অতি সুন্দর। সংস্কৃত ভাষার প্রসাদগুণ রক্ষা করিয়া কবির ভাব ও লিপিচাতুর্য্য রক্ষা করিয়া এমন ভাবে অনুবাদ করিতে আমরা অন্য কোন বাঙালীকে দেখি নাই। বাঙালী লেখকগণের দোষই এই যে, তাঁহারা মূল গ্রন্থের উপর নিজেদের ওস্তাদি ফলাইতে চেষ্টা করেন।

"জ্যোতিবাবু ওস্তাদ কবি, কিন্তু তাঁহার এমনই

সংযম যে তিনি অনূদিত গ্রন্থসকলের কোন খানেই ওস্তাদি করেন নাই, ঠিক যেমনটি আছে, তেমনটিই বাঙ্গালায় দেখাইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা এমনই ঐশ্বর্য্যশালিনী; তাঁহার ছন্দ এমনই মধুর ও এতই কোমল যে, অনূদিত গ্রন্থসকল পাঠ করিলে মনে হয় না যে উহা অনুবাদ মাত্র। এ বড় কম গুণ নহে, এ বড় কম সামর্থ্যের পরিচয় নহে। এই সকল নাটক-নাটিকা ভাষান্তরিত করিয়া জ্যোতিবাবু যে বাঙ্গালা ভাষার কতটা পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝা যাইবে না। আগামিগণ জ্যোতিবাবুর নিকট চিরঋণী থাকিবেন। ইহাই জ্যোতিবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি। এই সকল পুস্তক লিখিয়া দুই মুষ্টি অন্ন করিয়া খাওয়ার ভাগ্য জ্যোতি বাবুর নাই। প্রথমতঃ তিনি ধনী-পুত্র, সমাজের সর্ব্বোচ্চ-স্তরন্যস্ত মহদ্বংশজাত, সুতরাং তাঁহার অর্থাভাব নাই, কেতাব বেচিয়া তাঁহাকে খাইতে হইবে না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার একাদশখানি গ্রন্থের যথোপযুক্ত আদর বাঙালী এখনও করিতে শিখে নাই—এখনও করিতে পারিবে না। বটবীজ বপন করিয়া বটের শ্যাম-শীতল ছায়ার উপভোগ রোপণকারীর ভাগ্যে ঘটে না, তালবৃক্ষ রোপণ করিয়া সুপক্ক তাল-ফলের আস্বাদ রোপণকারীর ভাগ্যে

ঘটে না। জ্যোতিবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে ন্যগ্রোধ-শিশু স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার 'অক্ষয় বট' পল্লবযুক্ত বিশাল কাণ্ডসকল বিস্তীর্ণ করিয়া এখনই শীতল ছায়া প্রদান করিবে না। তাঁহার তাল-শিশু কাব্যরসে সুপক্ক তাল-ফল এখনই দান করিবে না। তবে তিনি ভাগ্যবান, তাঁহার অক্ষয় বট চিরকাল 'অক্ষয় বট' হইয়া থাকিবে, তাঁহার কাব্যের তালবৃক্ষ অনন্ত গগন ভেদ করিয়া উচ্চ শীর্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া চিরকাল লোকলোচনের গোচরীভূত থাকিবে।"

য়ুরোপীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ। ফরাসী লেখক মলিয়র-বিরচিত প্রহসন অবলম্বনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'হঠাৎ নবাব' রচনা করেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইংরাজী ও ফরাসী নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে এই সকল গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ইংরাজী হইতে অনূদিত

জুলিয়াস সিজার ১৩১৪

এপিক্‌টেটসের উপদেশ ১৩১৪
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা ,,

ফরাসী হইতে অনূদিত

হঠাৎ নবাব (মোলিয়র-কৃত 'ল-বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' হইতে) ১২৯১
দায়ে পড়ে দারগ্রহ (মোলিয়র-কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' অবলম্বনে) ১৩০৯
ভারতবর্ষে (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত) ১৩১০
ফরাসীপ্রসূন (গল্প ও কবিতা-সংগ্রহ) ১৩১১
শোণিতসোপান (উপন্যাস) ১৩২৭
ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ ,,
সত্য, সুন্দর, মঙ্গল (ভিক্টর কুঁজ্যা প্রণীত ফরাসী গ্রন্থ হইতে) ,,
অবতার (থিয়োফিল গ্যতিয়ে হইতে) ১৩২৯
মিলিতোনা (ঐ) ১৩৩০

এতদ্ব্যতীত বহু ফরাসী গল্প ও কবিতার অনুবাদ বহু মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরেও তাঁহার এইরূপ অনেক গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল অনুবাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এস্থলে সম্ভব নহে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী-দিগের বিখ্যাত রাষ্ট্রসঙ্গীত "লা মার্সাইয়েজে"র মূল স্বরের অনুগত বঙ্গানুবাদ ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বঙ্গানুবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

আয়রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে ;
অত্যাচার ঐ দ্যাখ—গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার ?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে স্ত্রী-পুত্রসংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ-সংগঠন ;
চলো—চলো—মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু-রক্ত হোক্ সিঞ্চন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য যে মৌলিক জাতীয় সঙ্গীত কিছুকাল পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন, স্বদেশ-প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে ও উদ্দীপনায় উহা উপরি-ধৃত বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতের নিকট নিষ্প্রভ দেখাইবে না,—

শঙ্করী-কাওয়ালী

চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে, সাধ্‌রে সাধ্‌ সবে দেশেরি কল্যাণ,
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ জাগো সবে বল মা গো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাওরে আন্‌তে নব নব জ্ঞান,
নবভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান॥
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল উড়াইয়ে একতা-নিশান।

ব্রহ্মদেশীয় নাটক। ১৩১৩ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "রজতগিরি" নামক একটি ব্রহ্মদেশীয় নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে অনুবাদ!

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও অতিশয় সত্য যে, আমরা ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা ইউরোপীয়দিগের

বিষয় যতদূর জ্ঞাত আছি, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমাদের দেশভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে ততদূর অবগত নহি। ইংরাজ লেখকগণের মধ্যবর্ত্তিতায় আমরা তাঁহাদের পরিচয় লইয়া থাকি। কোনও জাতির সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে সে জাতিকে ভাল বুঝা যায় না। কিন্তু অতি অল্প বাঙ্গালীই গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলুগু—এমন কি, হিন্দী সাহিত্যেরও আলোচনা করিয়া থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুদিন সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাই প্রদেশে ছিলেন এবং তথায় অবস্থান-কালে সযত্নে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি মারাঠী ভাষা হইতেও রত্ন আহরণ করিয়া বঙ্গভাষা-জননীর কিরীট-শোভা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 'সাধনা'য় 'মারাঠী ও বাঙ্গলা'-শীর্ষক একটি সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। উহার উপসংহারে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেজ বৌ' প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থ মারাঠীতে অনূদিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীর অন্যান্য প্রদেশের ভাষাশিক্ষার উপকারিতা প্রদর্শন করেন। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"যখন দেখিব আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থসকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব এক সময়ে সমস্ত য়ুরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষার আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক বাঙ্গালার সাহিত্য-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালা ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জানিব বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির উদয় হইয়াছে।"

দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস "ঝাঁশী সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাঁচে চরিত্র" নামক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে প্রখ্যাত বীরাঙ্গনা মহারাণী লক্ষ্মীবাইএর একটী প্রামাণিক ও আনুপূর্ব্বিক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের একটী জাতীয় অভাব মোচন করেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ এই গবেষণাপূর্ণ প্রস্তাবটীর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

কয়েক বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয়ের সাধ্বী পত্নী রমাবাই রাণাড়ে তাঁহার অলোকসামান্যচরিত্র স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার

স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উহারও একটি সুললিত বঙ্গানুবাদ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। আমরা এই প্রস্তাবটী পাঠ করিবার জন্য আগ্রহের সহিত মাসের পর মাস 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতীক্ষা করিতাম। এই প্রস্তাবটী শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রস্তাবের বিষয়ীভূত মহাত্মার, পুণ্যচরিত্রা লেখিকার এবং নিপুণ অনুবাদকের গুণে উহা বঙ্গবাসীর নিকট চিরদিন সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরেরও কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা অনুবাদ করিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই অনুবাদ-কার্য্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ—লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-বিরচিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্যে"র বঙ্গানুবাদ। মান্দালের কারাগারে অবরুদ্ধ অবস্থায় মহাত্মা তিলক মূলগ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও শাস্ত্রজ্ঞানের যে বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহার পরিচয় না লইলে দরিদ্র থাকিত। প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় নয় শত পৃষ্ঠা ডিমাই

অক্টেভো সাইজের এই গ্রন্থ অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে (৭ই পৌষ ১৩৩০ ইং ১৯২৪) ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথের সাহায্যে এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অনুবাদকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন:—

"লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত "গীতা রহস্য" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ-ক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-কামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-কল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরু ভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায় এতদিনের পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার

পূর্ব্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।"

এই গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এস্থলে বলা যাইতে পারে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহাত্মা তিলকের গীতারহস্যের উপক্রমণিকার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন এবং লোকমান্য তিলককে অনুবাদ-প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখেন। মহাত্মা তিলক স্বয়ং ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ে উহার হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ প্রকাশ করাইয়াছিলেন এবং তামিল, তেলুগু ও কর্ণাটী সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাতেও উহার অনুবাদ প্রকাশ করাইবেন। সুতরাং তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পাইয়া সানন্দে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া লিখিলেন:—

বোম্বাই
২০শে অক্টোবর ১৯১৭।

মহাশয়,

ইহার বহুপূর্ব্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি

নাই, তজ্জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। উহার কারণ এই যে, আমি গত দেড় মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম এবং আপনার পত্রের উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এ ওজর কিছুই নহে তাহা জানি, কিন্তু ইহাই যথার্থ কারণ।

বাঙ্গালা ভাষায় আমার গীতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত আমি ব্যগ্র। কিন্তু বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় উভয়বিধ ভাষাতে ব্যুৎপত্তি আছে এতাবৎকাল এরূপ কোনও পণ্ডিতের সন্ধান পাই নাই। গত এপ্রিল মাসে আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম এবং তখন শুনিয়াছিলাম যে আপনার এক ভ্রাতা গীতারহস্যের উপক্রমণিকার একটী বঙ্গানুবাদ একটী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তখন শুনিয়াছিলাম যে তিনি সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করিবেন কি না তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং আমি আর ঐ বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করি নাই; আমি মনে করিতেছিলাম আর কাহাকেও এই কার্য্যের ভার প্রদান করিব। এখন দেখিতেছি আপনি এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন, তখন আমার আর কোনও ভাবনা নাই, এবং অনুবাদ যে ঠিক মূলানুযায়ী হইবে তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত।

আমি যে অনুবাদককে তিন হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিব এ সংবাদ সত্য নহে। তবে প্রয়োজন হইলে অনুবাদের জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় করিতে এবং অনুবাদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও আমি ইহাই করিয়াছি এবং অধুনা যন্ত্রস্থ তামিল, তেলুগু ও কর্ণাটী সংস্করণের জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেছি।

আমার অভিপ্রায় এই যে অনুবাদটী মূল মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায় বিষয়ের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হয়। আমি যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় বিষয়টীর আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে আমাদের মেয়েরাও অনায়াসে সকল কথা বুঝিতে পারেন। অনুবাদটীও এইরূপ হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, আমার ইচ্ছা অনুবাদের ছাপা ও বাঁধাই ঠিক মূলের অনুরূপ হয় এবং উহার মূল্য তিন টাকা মাত্র ধার্য্য হয়।

এই সকল সর্ত্তে কার্য্য করিলে আমি অনুবাদ হইতে কিছুই লাভ করিতে চাহি না, বরঞ্চ অনুবাদককে সমস্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। যদি তিনি অনুবাদ নিজ ব্যয়ে

প্রকাশ না করেন, আমি অনুবাদককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া নিজে অনুবাদপ্রকাশের সমস্ত ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। এ পর্য্যন্ত যতগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির করিবার পূর্ব্বে উপরিলিখিত প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। আগামী সপ্তাহে আমি পুণায় থাকিব, সুতরাং পত্রের উত্তর পুণার ঠিকানায় (কেশরী অফিস, পুণা সিটি) পাঠাইবেন।

পত্রোত্তর প্রদানের বিলম্বের জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভবদীয়

(স্বাক্ষর) বাল গঙ্গাধর তিলক।

পরবর্ত্তী ডিসেম্বরে মহাত্মা তিলক পুনরায় সত্যেন্দ্রনাথকে লিখেন :—

পুণা

২০শে ডিসেম্বর ১৯১৭

মহাশয়,

আমি কংগ্রেসের জন্য আগামী ২৬শে হইতে ৩০শে

পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিব। তখন আপনার কোনও প্রতিনিধির সহিত গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিবর্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আমি অবস্থান করিব। কংগ্রেস অনুসন্ধান কার্য্যালয়ে কিংবা অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে আমার ঠিকানা অবগত হইতে পারিবেন। আপনার কোনও প্রতিনিধি বা বন্ধুকে আমার সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া বাধিত করিবেন।

ভবদীয়

(স্বাক্ষর) বাল গঙ্গাধর তিলক।

অতঃপর সত্যেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে লোক-মান্য তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের সহিত বাঙ্গানুবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হয়। তিলক মহোদয় ১০০০ খণ্ড বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য উপযুক্ত কাগজ ক্রয় করিয়া দেন এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ নাম মাত্র মূল্যে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে প্রতিশ্রুত হন। সাত আট বৎসর বিপুল পরিশ্রম করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে
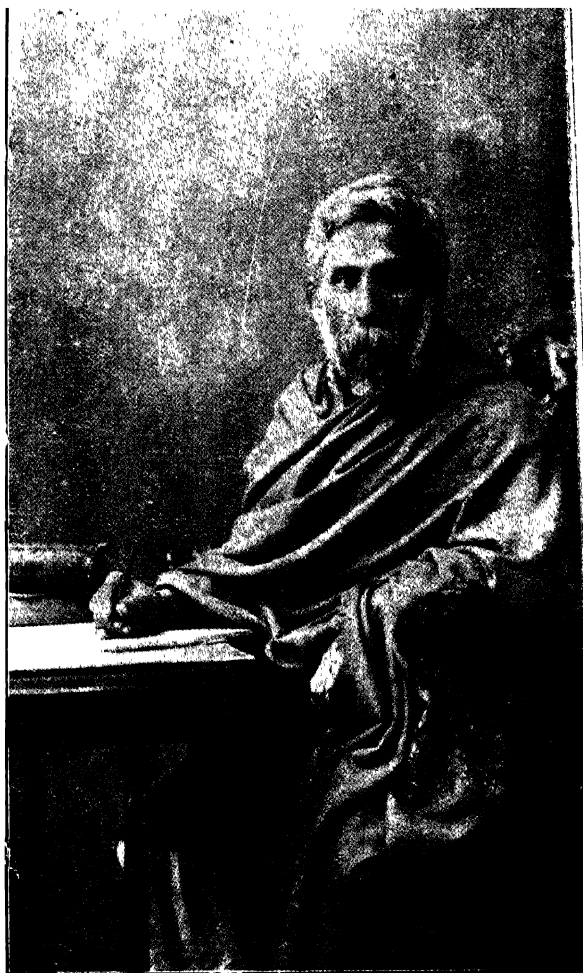
এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী এই অধ্যবসায়ের মূল্য বুঝিবে কি? ভারততিলক বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব :—

"একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মহাত্মা তিলকও সেইরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার। ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সমন্বয়সাধনের মুখ্য তাৎপর্য্যটা কি, তাহারই তিলক তাঁহার গীতারহস্যে আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্ম্মই গীতার মধ্যবিন্দু, মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম্মের পরিপন্থী নহে, পরন্তু কর্ম্মের পরিপোষক ও সহায়; জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মে গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে। এই ভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও

কর্ম্মযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। কর্ম্মই যে গীতার প্রধান কথা তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা অর্জ্জুনকে যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শুধু "কর্ম্ম করিবে" বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না; ভগবান বলিয়াছেন, যাহা স্বধর্ম্ম-অনুমোদিত সেই কাযই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের হস্তে কর্ম্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মই শ্রেয়। এইরূপ কথা বলাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সম্যক্‌রূপে সাধিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য পৃথক্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইলেও, জ্ঞান-ভক্তিসমন্বিত কর্ম্মযোগের প্রাধান্যই যে গূঢ়ভাবে গীতাতে সূচিত হইয়াছে, ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমস্ত উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের পোষকতায় সমস্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী শাস্ত্রকেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রের এত কথা আনুসঙ্গিক ক্রমে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, একজন যদি মনোযোগ সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করে, তাহার বেশ একটু শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে এবং সে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। এই গ্রন্থরচনায় মহাত্মা তিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি

দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি কারাগারে থাকিয়া যখন এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহার হাতের কাছে স্মৃতি-সাহায্যকারী কোন গ্রন্থই ছিল না—তিনি ইহার সমস্ত উপকরণই স্বকীয় পূর্ব্বসঞ্চিত স্মৃতিভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়া রচনাকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার স্মৃতিশক্তি! ধন্য তাঁহার প্রতিভা!"

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সময়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে (১৩০৯ বঙ্গাব্দে) তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ৺সারদাচরণ মিত্র মহোদয়গণের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তখন ভারতগৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয়বার পরিষদের সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। সাহিত্যপরিষদের সহিত যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংসৃষ্ট ছিলেন সেই সময়ে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) তিনি উহার এক অধিবেশনে "ভারতে নাট্যের উৎপত্তি" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি "প্রবন্ধমঞ্জরী"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাঁচিপ্রবাস। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচিতে তদীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বাস করিয়াছিলেন। বাসের জন্য তিনি মোরাবাদী নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর "শান্তিধাম" নামক একটি ভবন নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ঈশ্বরোপাসনার জন্য একটী সুন্দর উপাসনা-মন্দিরও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

এই 'শান্তিধামে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যের সাধনা করিয়াছেন, সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছেন, চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করিয়াছেন এবং ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন। রাঁচির শান্তিধাম সেইজন্য বাঙ্গালীর নিকট তীর্থস্বরূপ গণ্য হইবে।

'জীবনস্মৃতি।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নীরব সাধক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতে ভালবাসিতেন। 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশ করা তিনি আত্মগর্ব্ব পরিতৃপ্তির উপাদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের কাহিনী প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সুহৃদ্বর সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্নেহের অধিকারে বহু যত্নে তাঁহার স্মৃতিকথা

লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে বহু বিস্মৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৈশোরে মাতৃবিয়োগ এবং যৌবনে পত্নীবিয়োগ-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরলোকগমনেও তিনি বিষম শোক পাইয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তে 'পিতৃস্মৃতি'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তাঁহার পুণ্যচরিত্র পিতৃদেব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মাত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠা সহোদরা সৌদামিনী এবং বাল্য-সুহৃদ্ অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী সোদরাতুল্যা শরৎকুমারীকে হারাইয়া বিশেষ কাতর হন। এই সময়ে তিনি মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিয়াছিলেন :—

রবিবার

[৯ই ডিসেম্বর ১৯২৩]

ভাই স্বর্ণ

তোমার আন্তরিক শুভ কামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করলুম। মেজদাদা গেলেন, দিদি গেলেন, শরৎ গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার

পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা। বোনের মধ্যে তুমি আর বর্ণ—তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, এই আমার একান্ত বাসনা। যতই দিন যাচ্চে, যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্চে, ততই স্নেহ-ভালবাসার লোকদের আঁকৃড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ-ভালবাসার মর্য্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

স্নেহের
নতুন দাদা।

এই সকল শোক-তাপে কাতর হইলেও, বার্দ্ধক্য-জনিত দুর্ব্বলতা সত্বেও, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিয়মিত ভাবে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চ্চা এবং ভগবানের উপাসনা করিতে একদিনও বিরত হন নাই। ভগ্নদেহে তিনি তিলকের 'গীতারহস্যের' অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, অসংখ্য 'মাসিক পত্র'-সম্পাদকের অনুরোধে তিনি গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের কয়েক সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বেও রাঁচিতে মহা উৎসাহের সহিত তাঁহার শেষ "মাঘোৎসবের" অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুজনীয়া

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রে এই অনুষ্ঠানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :—

"কাল ১২ই মাঘে আমাদের ১১ই মাঘ হল—গায়িকা মেয়ের দল এখন কেউ রাঁচিতে নেই ; সপ্তাহ খানেক আগে থেকে নতুন ঠাকুরপো প্রবীর মিহিরকে দুটী গান শেখালেন—'আজই আমাদের মহোৎসব'—এটা আমার ছেলেবেলায় ১১ই মাঘে প্রথমেই বিষ্ণু গাইতেন, তাই ওটা শেখাতে বল্লুম, আর 'প্রণমি তোমারে', প্রথমটা প্রথমে দ্বিতীয়টা শেষে। ওদের ছেলেমানুষী গলা, বিশেষতঃ মিহিরের, শুন্‌তে খুব ভাল লাগছিল—ওদের দু' ভাইকে শাদা রেশমী পাঞ্জাবীর উপর, কালো ডুরির কায করা শাদা শালের জোব্বা পরিয়ে দিয়েছিলুম—বেশ দেখাচ্ছিল! কুসুমতলায় সব উপরকার ধাপে কেবলমাত্র জয়কালী বাবু বস্‌লেন, তার নীচের ধাপে নতুন ঠাকুরপো ডাইনে বামে প্রবীর-মিহিরকে নিয়ে বস্‌লেন। আমাদের সংস্কৃত মন্ত্রগুলোও নতুন ঠাকুরপোর সঙ্গে সমস্বরে প্রবীর মিহির বল্লে ; ওরা সবার গলায় মালাও দিলে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকদের জলপান খাওয়ালে—লোক মেয়ে-পুরুষ মিলে ৬০। ৭০ জন হয়েছিল ; জয়কালী বলেছিলেন ৩০। ৩৫শের বেশী হবে না, ভাগ্যিস

৬০ জনের মত খাবার তৈরি রাখা হয়েছিল! তাতেও শেষে কুলল না, গোঁজা মিলন দিয়ে কোনও প্রকারে কায সারা গেল। খাবার বেশ ভাল আর ঠোঙা ভরা হয়েছিল—বড় বড় কচুরি সিঙাড়া দর্বেশ মিঠাই পান্তোয়া কমলালেবু; আগের দিন চাকররা, ছেলেরাও তাতে যোগ দিয়েছিল, স্ফূর্ত্তির সহিত রঙ্গীন কাগজের ফুল ও মালা অনেক তৈরি করে তা দিয়ে দুই উৎসব-তোরণ আর কুসুমতল্পার চারিধার খুব সাজিয়েছিল। নতুন ঠাকুরপো এক নহবৎও যোগাড় করেছিলেন। কমলা শান্তি হাবলু এঁরা চার-পাঁচটা গান গাইলেন। আমাদের ক্ষুদ্র পল্লী রাঁচির পক্ষে আমাদের ১১ই মাঘ নেহাৎ মন্দ হয়নি, কি বল ?"

বৃদ্ধ বয়সে পর্য্যন্ত অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করায় জ্যোতিবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। উপরিবর্ণিত ঘটনার ছয় সপ্তাহের মধ্যে—২০শে ফাল্গুন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ বুধবার সায়াহ্নে ইহলোকের আত্মীয়-বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচির 'শান্তিধাম' হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া উচ্চতর লোকে চিরশান্তিধামে গমন করেন।

স্মৃতিসভা।—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিল্প ও সাহি-

ত্যের অক্লান্ত সেবার জন্য এবং তাঁহার মধুর চরিত্রের জন্য বাঙ্গালায় সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বর্গা-রোহণের পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্মৃতি-সভাদির অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটী স্মৃতি-সভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটী বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উহার সভাপতি ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই সভায় তাদৃশ লোকসমাগম হয় নাই। দ্বিতীয়টী 'আশুতোষ কলেজের' ছাত্রবর্গের দ্বারা ভবানীপুর 'সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে' আহূত হয় (২১শে চৈত্র, ১৩৩১)। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ডাক্তার অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহু মহিলা ও ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস।—যাঁহারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্রবে আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার অসাধারণ বিনয়, অমায়িকতা, সৌজন্য ও মহত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যেমন সরলপ্রকৃতি ছিলেন, তেমনই উদার ছিলেন। তাঁহার উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান ছিল না। রাঁচিতে অনেকে তাঁহার আবাস-ভবনে বেড়াইতে আসিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে তিনি যেরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন, সমাজের নিম্নতম স্তরের ব্যক্তিগণকেও সেইরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার মানব-প্রীতি অতি গভীর ছিল। তাঁহার চিত্রপুস্তকে তিনি যেমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ও আত্মীয়-বন্ধুগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনই 'পাথাটানা কুলী' মুটে-মজুরদেরও চিত্র সযত্নে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার গভীর মানব-প্রীতির ও সমদর্শিতার পরিচয় দেয়। তিনি মানবকে কি ভালই বাসিতেন! শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে, চিত্রকরগণ মানব ব্যতীত কত সুন্দর বিষয় চিত্রে অঙ্কিত করিবার জন্য অন্বেষণ করে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানবের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় আর কোথাও দেখেন নাই। তাঁহার চিত্রের বিষয় কেবল মানুষের মুখ।

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর।'

যিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে পর্য্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি যে আত্মীয়স্বজনকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত যে পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকগণ তাঁহার স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চন্দন পাঠাইয়া দিলে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যে ক্ষুদ্র পত্র পাঠাইয়া-ছিলেন তাহারও কিয়দংশ পাঠ করিলে তাঁহার ভগিনী-স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়:—

"পাইয়া চন্দন তব হইলাম প্রীত
নন্দন না পারে দিতে এ হেন অমৃত!
প্রাণ খুলি করি বোন্ এই আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হয় যেন তব যত-কিছু সাধ।"

তোর
নতুন দাদা।

তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্য ও স্বদেশ-প্রীতি যে কত গভীর ছিল তাহা তাঁহার রচনাবলীর পরিচয়প্রসঙ্গেই পাঠকগণ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ

ভগবদ্ভক্তি তাঁহার অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বহুদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এমনই উদার ছিলেন যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত—দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। রাঁচিতে অবস্থানকালে একদিন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মোরাবাদী পাহাড়ের শৃঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত উপাসনামন্দিরে বসিয়াছিলেন, এমন সময় দুইজন হিন্দুস্থানী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'এখানকার দেবতা কোথায়?' ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলিলেন 'এখানে কোনও দেবতা নাই।' তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। অবশেষে তাহারা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, যিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই দেবতা কোথায়? এমন সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই স্থানে আগমন করিলে সেই হিন্দুস্থানী ব্যক্তিদ্বয় তাঁহাকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। বাস্তবিক শেষ জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি এবং

করুণাময় ও স্নেহপূর্ণ আনন দেখিলে তাঁহার মানসকন্যা স্বপ্নময়ীর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইত :—

"দেখিনি মানব হেন দেবতার মত,
জানিনে দেবতা হেন মানুষের মত।
ললাটে বিকাশে তাঁর স্বরগের জ্যোতি,
নয়নে নিবসে তাঁর মর্ত্ত্যের মমতা।"

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান কোথায় তাহা আলোচনার সময় এখনও আসিয়াছে কি না জানি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের নানা বিভাগে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রীতি-গীতি, প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তিনি ফরাসী আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব প্রথম প্রহসন রচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী একদিন বঙ্গবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাঁহার গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার পরিচয় দেয়। তিনি সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয়, ইংরাজী ও

ফরাসী ভাষা হইতে নানা গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু একথা অনেকেই দুঃখের সহিত স্বীকার করেন যে, তিনি তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার অনুজা স্বর্ণকুমারী স্বয়ং এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন, এরূপ প্রতিভাশালী সাহিত্য-সেবককে কখনও কোনও সাহিত্যসভায় সভাপতি-পদে বৃত হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিনয় ও লজ্জা এবং সর্ব্বদা আত্মগোপন-চেষ্টা মূল কারণ হইতে পারে, কিন্তু আমরাও যে তাঁহার প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি তাহা মনে হয় না। কেন এরূপ হইল? চিন্তা করিলে মনে অনেক কথাই উদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্রের কথা বলিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই বারম্বার আমাদের স্মৃতি-পথে ভাসিয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের

কার্য্য দেশ-কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখনও ভস্মাচ্ছন্ন, কখনও প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।"

আমাদের মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি জীবিতকালে তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেশবাসীকে যে মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন—

"লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান"

—সেই মন্ত্র তিনি তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে যাহা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল, একদিন তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী, "অনন্ত অসীম কাল আছে আগে অনন্ত জীবিত-মণ্ডলী"—একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদানের মূল্য বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে এবং তিনি আজীবন দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য, লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন উপেক্ষা করিয়া

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও অসীম পরিশ্রমের সহিত নানাপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া সৎসাহিত্যের প্রচার দ্বারা জাতীয় সাহিত্যকে উন্নত করিবার যে প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-কারগণ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাপ্য উচ্চ ও গৌরবময় আসন একদিন তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

সম্পূর্ণ